তারার আঁধার

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সিংহ

১ পঞ্চানন ঘোষ লেন

কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :

দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস

দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ

২৮ বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ :

পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

ব্লক :

কালার স্টুডিও

বাঁধাই :

নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পরিবেশক :

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

শ্রীযুক্ত ত্রিদিবেশ বসু

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

প্রয়োজন এবং অস্তিত্ব। কথা দুটো খুব নতুন নয়। সাহিত্য ও দর্শনে বহুকাল থেকে নানাভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে—বোধহয় সেই প্লেটোর আমল থেকে। তারপর কালের পরিবর্তনের সংগে সংগে, সমাজের ও জীবনের বিবর্তনের সংগে সংগে কথা দুটো এক গুরুতর ভূমিকা নিয়েছে—তার প্রয়োজন ও অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে সরবে ঘোষণা করেছে।

'তারার আঁধার'-এর যে নায়ক, তার জীবনের বিরাট ট্রাজেডির মধ্যে আছে একটা আঙ্কিক গোলযোগ। এই প্রয়োজন ও অস্তিত্বের বে-হিসেব। এই হিসেব অনেকটা অর্থনীতির ডিম্যাণ্ড ও সাপ্লাইয়ের মতো। মেপে-মেপে, ভেবে-ভেবে চলতে হয়। নইলে জীবনের জটিলতায় হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আসল কথা, এ-সব চরিত্র আমার দেখা। আমি দেখেছি এই বাংলাদেশে 'তারার আঁধার'-এর নায়করা জন্মায় যত, মরেও তত। দেখেছি আর ভেবেছি। তারপর একদিন আমার সেই দেখা ও ভাবা-কে মিলিত করে একটা গল্পে রূপ দেবার চেষ্টা করি। 'ছায়াবাজি' আমার গল্প সংকলনে বেরিয়েছিল। কিন্তু তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে যে, বিষয়টি এত ব্যাপক, প্রশ্নটি এত গভীর যে, তাকে ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে বন্দী রাখলে অন্যায় হবে। তাই, ১৩৬৬ সালের মাঘ সংখ্যা 'উল্টোরথ'-এ গল্পটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

'তারার আঁধার' তারই পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত উপন্যাস। এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নইলে বিষয়টির প্রতি অবিচার করা হতো। তবে আমি কতখানি আন্তরিকতা ও যোগ্যতার সঙ্গে গল্পটি বলতে পেরেছি সে বিচার পাঠকমহলের।

এ উপন্যাসের যাঁরা পাত্র-পাত্রী, তাঁরা জীবিত কোন বিশেষ চরিত্র বা বিশেষ ব্যক্তি নয়। যদি সে সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তবে সেটাকে নেহাৎই আকস্মিক বলে মেনে নিতে হবে।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৩২-এ পদ্মপুকুর রোড,
কলিকাতা ২০

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

ঝাঁসীর রাণী
নটী
যমুনা-কে-তীর
মধুরে মধুর
প্রেমতারা
এতটুকু আশা
তিমির লগন
পথ চলি আনন্দে
কি বসন্তে কি শরতে

মাঝরাতে আমার দরজায় ঘা পড়লো।

প্রথমে ঘুমের ঘোরে মনে হলো শুনতে ভুল করেছি। তারপরে স্পষ্ট শুনলাম, দরজায় ঘা পড়ছে আর কে যেন আমাকে নাম ধরে ডাকছে।

আশ্চর্য হলাম। এখানে আমাকে এমন করে কে চেনে?

মধ্যপ্রদেশের পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি শিল্পকেন্দ্রের এই উপান্ত অঞ্চলটিতে আমি এসেছিলাম সরকারী কাজে। প্রথমে মনে হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে ছয়শো মাইল দূরে এই নির্বাসন সহ্য করতে পারব না। আজন্মকালের পরিচিত কলকাতার জন্যে মনটা সব সময় টানবে।

কিন্তু কেমন করে যেন জায়গাটাকে ভালবেসে ফেললাম। বড় সুন্দর, বড় নির্জন জায়গা। এর একমাত্র সম্পদ হলো শালগাছের রিজার্ভ ফরেস্ট।

কলকাতার মানুষ আমি। নতুন সেক্রেটারিয়েট বাড়িটার চেয়ে উঁচু কিছু দেখিনি জীবনেও। এখানে এসে, এই শালগাছগুলির উন্নত উদার মহিমা আমাকে এক নিমেষেই মুগ্ধ করলো। আমাকে জয় ক'রে নিল তারা। ঈষৎ আন্দোলিত মাটির বুক থেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে গাছগুলি, দেখে দেখে অনেক সময় আমার মন এক প্রসন্ন উদারতায় ভরে গিয়েছে। অনেক দুঃখ ও আঘাত ভুলতে সাহায্য করেছে আমাকে ঐ বনস্পতির দল।

কেমন করে যেন জায়গাটা ট্যুরিস্ট দপ্তরের 'ভারত ভ্রমণ করুন' পোস্টারের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। এই সুন্দর সমুন্নত গাছগুলিকে, যদি রেলওয়ে থেকে পোস্টার করতো, আর কয়লাঘাটা স্ট্রীটের অফিসের ফুটপাথে—তাদের গায়ে যদি যথেচ্ছ পানের পিচ ফেলে

নোংরা করতো বেলা একটায় টিফিনের জনতা—আমি দুঃখিত হতাম। মহৎ ও বৃহত্তর এক উদার প্রাণশক্তির প্রতীক যেন ঐ গাছগুলি। তাদের অবমাননায় আমিও নিজেকে অপরাধী বোধ করতাম।

তার চেয়ে এ অনেক ভাল হয়েছে। মনে মনে এই জায়গাটাকে আমিই আবিষ্কার করেছি, এ কথা ভেবে আমি আনন্দ পেয়েছি। জায়গাটা এখানেই ছিল, আমিও ছিলাম। যেদিন দুজনের দেখা হলো, সেদিন এখানকার প্রকৃতি এবং অরণ্যের সবটুকু অবারিত সৌন্দর্য এক পরিপূর্ণ অখণ্ড রূপে আমার চোখে দেখা দিল। এ-ও একরকম আবিষ্কার। কেউ যে জায়গাটাকে জানে না—আমি যে কাজ করতে করতে চোখ তুললেই গাছগুলির উন্নত, মহিমময় রূপ দেখতে পাই, বারবার আমার মনটাও যে এক অজানা উদারতায় ভরে ভরে ওঠে, এই যেন ভালো হয়েছে, ঠিক হয়েছে।

এখানকার মানুষজনের সঙ্গে ক্রমে আলাপ হয়েছে। স্টেশানে যখন কাগজ আনতে গিয়েছি, স্টেশানমাস্টার নিজে থেকেই আলাপ করেছিলেন। একদিন চা-এ ডেকেছিলেন। আলাপ করে আমারও ভাল লেগেছে। শহরে থাকলে মানুষের সঙ্গে একটা হৃদয়ের সম্পর্ক গড়তে সময় লাগে। এখানে এই সুদীর্ঘ অবসরের সময় নিয়ে আর কিছু করবার থাকে না। এখানে তাই এইসব পরিচয়, এইসব বন্ধুত্বগুলিও মূল্যবান বোধ হয়।

স্টেশানমাস্টার আমার নামটা জানেন। কিন্তু শুধু ত' তাঁর গলা নয়। আরো যেন কে ডাকছে বিপন্ন কণ্ঠে—

—বাদলদা, দরজা খোল, বাদলদা, দরজা খোল।

দরজা খুলতে যে ঢোকে, তাকে দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি। কুমুদ। আমাদের বিজয়ের ছোটভাই কুমুদ।

শেষ দেখা হয়েছিল কুমুদের সঙ্গে আজ থেকে দু'বছর আগে। অফিস থেকে বদলীর অর্ডার নিয়ে বেরুচ্ছিলাম আমি। দেখা হতে

হয়তো কুমুদকে বলেছিলাম, যে যাচ্ছি নতুন জায়গায়। আর তখন যেমন অনেককেই বলেছি, সময় পেলেই যেও, বেড়িয়ে এসো নতুন জায়গায়, তেমন হয়তো কুমুদকেও বলেছি, মনে নেই।

সেই কথা মনে করেই কি কুমুদ এখানে এসেছে? তা-ও ত' মনে হয় না। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই কুমুদ হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে—শীগগির স্টেশানে চল বাদলদা, দাদা স্যুইসাইড করেছে।

—কি বললে?

—দাদা স্যুইসাইড করেছে, তুমি স্টেশানে চল বাদলদা!

—বিজয়? বিজয় দাশ স্যুইসাইড করেছে? আমি কুমুদের দিকে চেয়ে এই অসম্ভব কথাটা মাথা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। বিজয় দাশ, যাকে আমরা বলতাম 'Prometheus unbound'—যে দুঃসাহসী প্রমিথিউসের মতোই আকাশ থেকে আগুন চুরি করে সমস্ত জীবনটাকে জ্বালিয়ে তুলবার স্বপ্ন দেখতো, আমাদের দেখাতো, সেই বিজয় আত্মহত্যা করলো? বিজয়ের সে উন্নত মাথা, সেই রুক্ষ স্বর্ণাভ চুলের গোছা আর অস্থির প্রাণবন্ত দুটো চোখ যে আমার মনে ছবির মতো ভাসে। এখনও আবার জীবন্ত হয়ে উঠল সেই ছবি—বিজয় আত্মহত্যা করেছে?

আমার বিমূঢ় ভাব দেখে কুমুদ আমার গায়ে ধাক্কা দিল। বললো—চল বাদলদা, দেরী ক'রো না, তোমার পায়ে পড়ি।

তাড়াতাড়ি গায়ে জামা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সারাটা পথ কাঁদতে কাঁদতে গেল কুমুদ। বললো—

—বেশ আসছিলাম আমরা। কোন গোলমাল করে নি দাদা। হঠাৎ যেই বম্বে মেলটা গেল···

ছোট স্টেশান। স্টেশানের ঘড়িতে দুটো বাজতে মিনিট তিন বাকী। এমন সময় বম্বে মেলটা পাস করে যায় আর ফোরটিন-আপ স্লো করে মোশান। দুটো গাড়ি ক্রস করে যাবার সময়ে যে গুমগুম

শব্দ হয়, তাই শুনে কতরাতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ট্রেনের শব্দ দূর থেকে দূরে চলে গিয়েছে, আর রাতের নিঃশব্দ তারপরেও কতক্ষণ ধরে কেঁপে কেঁপে স্থির হয়ে এসেছে—আর আমার মনে হয়েছে ঐ গাড়ির সঙ্গে, ঐ বিলীয়মান শব্দের সঙ্গে আমারও যেন সঙ্গী হবার কথা ছিল।

স্টেশানে চড়াবাতি জ্বলছে। স্টেশানমাস্টার আর কয়জন কুলী একটা জায়গা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে স্টেশানমাস্টার এগিয়ে এলেন। বললেন—দেখুন ত' কি কাণ্ড! আপনার নামটা বলতে ভাগ্যে ভদ্রলোক চিনলেন…

আমি কোন কথা না শুনে এগিয়ে গেলাম। প্ল্যাটফর্মে শুয়ে আছে বিজয়। তার লম্বা চওড়া চমৎকার শরীরটা, যা নিয়ে সে চিরদিন সগর্বে মাথা তুলে ঘুরে বেড়িয়েছে—আজ সেই শরীরটাই অসহায় ভঙ্গীতে প্ল্যাটফর্মের ধুলোয় পড়ে আছে দেখে মনে ধাক্কা লাগলো সজোরে। বিজয় এমনি করে পড়ে থাকবে আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখব? এ ত' কোনদিনও ভাবিনি।

স্টেশানমাস্টার বিবেচক লোক। সমস্ত শরীরটা কম্বলে ঢেকে রেখেছেন। কাঁচাপাকা চুলভরা মাথাটা একটা বিশ্রী কোণ সৃষ্টি করে হেলে রয়েছে। একখানা হাত শুধু চোখের ওপর চাপা দেওয়া। আর চারিপাশে চাপ চাপ রক্ত। রক্ত এত লাল হয় আর কম্বলের রঙের সঙ্গে মিশে মিশে যায়, তা আমি জানতাম না।

বিজয়ের সে হাতখানার আঙুলগুলোর মধ্যে এমন কিছু দেখলাম আমি—অসহায় একটা মিনতি—একটা পরাজয়—অথবা আরও দুর্বোধ্য কিছু—বলতে পারি না। যেন ঐ আঙুলগুলো বিজয়ের জীবনের অনেক দিনের অনেক আশাভঙ্গের প্রতীক।

দেখে পা কাঁপতে লাগল আমার। মনে হলো সবটা অসম্ভব। একটা নিশিতে পাওয়া দুঃস্বপ্ন। আমাকে নিশিতে ডেকেছে

এই রাতে, আর ভুলিয়ে ভুলিয়ে এনে আমাকে এই দুঃস্বপ্ন দেখাচ্ছে। বিজয় দাশ এমনি করে পড়ে আছে—এ কেমন ক'রে হয়? মনে হলো বিজয়কে ডাকি। জিজ্ঞাসা করি—কি চেয়েছিলে? কি চেয়েছিলে বিজয়? কি ধরতে চেয়েছিলে ঐ হাতের মুঠোয়? যা চেয়েছিলে তা পাওনি বলেই কি অমন করে ছড়িয়ে রেখেছ হাত? না কি, বাধা দিতে চেয়েছিলে এই পরিণতিকে? এই পরিণতিকে আহ্বান ক'রে পরে ভয় পেয়েছিলে? ভেবেছিলে চোখ যদি ঢাকা দাও, তা হ'লে আর দেখতে হবে না?

এমন রাত যেন কারো জীবনে না আসে। কোথায় থানা, কোথায় পুলিশ—খবর দিতে রাত ভোর হলো। ডাক্তার প্রথমে সার্টিফিকেট দিতে চায়নি। কুমুদ, বিজয়ের মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে প্রামাণ্য কাগজপত্র দেখাতে তবে তিনি রাজী হলেন। সব হাঙ্গামা মিটিয়ে ছোট একটা ঝর্ণার ধারে বিজয়কে নিয়ে দাহ করতে দুপুর গড়ালো। কুমুদকে নিয়ে আমি একটা কালো পাথরের ওপরে বসলাম। দেখে মনে হলো, বিজয় দাশের শেষ শয্যা নেবার মতো উপযুক্ত জায়গাই বটে। জীবনের যে বিস্তৃতি, যে সীমাহীন ব্যাপ্তি শুধুই স্বপ্ন হয়ে বিজয়কে ইশারা করেছে—মৃত্যুর পর এই পরিবেশ যেন তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করলো। চারিপাশে শালবন, ওপরে অনন্ত আকাশ, আর আশপাশে উঁচুনিচু মাটির দিগন্তছোঁয়া প্রান্তরের উদারতা ও প্রশান্তি কি বিজয়কে এতটুকু স্পর্শ করবে না? এতটুকু শান্তি দেবে না?

কুমুদকে শান্ত করবার ভার নিলেন আমার স্ত্রী। তিনদিন বাদে কলকাতার গাড়িতে তাকে তুলে দিলাম আমি। মনে হলো, এই দুঃখের মধ্যেও কুমুদ যেন কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছে। গাড়ি ছাড়বার আগে করুণ হেসে কুমুদ বললো—কি জান বাদলদা, শেষ অবধি দাদাও বেঁচে গেল। ঐ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষেও একটা অভিশাপ হয়েছিল। আমরা কিছুই করতে পারলাম না...

অথচ দাদাকে ঐ ভাবে দেখা···ভালই হলো। তবে মা-র জন্যেই যা ভাবনা। তাঁকে ত' আর বোঝানো যাবে না।

বিজয়ের মা। সেই শান্ত, দুঃখী মানুষটির কথাই মনে হলো। লাগবে যা, তা ঐ মাতৃহৃদয়েই। শূন্য হয়ে যাবে একটা বুক।

তারপরে, মাসছয়েক বাদে আমি ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম। বিজয়ের কথা বলতে গিয়ে আর একটা ধাক্কা খেলাম বুকে। একটা মানুষ কি এমনি করেই নিঃশেষ হয়ে যায়? আর অপ্রয়োজনীয় যখন হয়ে যায় একটা মানুষ, তাকে কি এমনি নির্মম পরিহাস করতে হয়?

সহানুভূতি যে যা জানাল, তা একান্তই মুখে। দিলীপ বললো —খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু বিজয় অনেকদিন আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন ত' তাকে কোন সভাসমিতিতেও দেখতাম না। কি করছিল ইদানীং—তাও জানতাম না। সত্যি, ভাবলে কি রকম লাগে, তাই না?

দিলীপই এনেছিলো বুলা রায় আর পিকপিক সোমদের খবর। বললো—বুলা রায়ের কথা আর ব'লো না। বললো, নিউরসিস হয়েছিলো কি? কি ট্র্যাজিক! আর মিসেস সোম ত' প্রথমে চিনতেই পারলেন না। তারপর বললেন—frustration মানুষকে দেখ কি করে দেয়!

মাধবীর কাছে আমি যাইনি। তার কাছে ত' বিজয় অনেকদিন আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। খবরটা পেয়ে সেও শুধু মুখে সহানুভূতি জানাবে, তারপরে তার ছেলেমেয়ে অথবা স্বামীর কোন সুখসুবিধে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিজয়কে ভুলে যাবে—তা দেখতে আমার যেতেই ইচ্ছা হয়নি।

অরুণ খবর পেয়ে দিল্লী থেকে বেলাকে বিজয়ের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিজয়দের বাড়িতে বসেও মনে হলো, ইতিমধ্যেই

যেন ফাঁকটা ভরতে শুরু করেছে। বেলা আর অরুণের ছেলেকে নিয়ে বিজয়ের মা খানিকটা সান্ত্বনা পেয়েছেন। সুজয়ের বিয়ের কথাও ভাবছেন বলে কথাবার্তায় মনে হলো। উঠে আসবার সময়ে দেখলাম বিজয়ের বাবার ছবির পাশে বিজয়ের একটা ছবি ঝুলছে।

বিজয়ও তাহলে ছবি হয়ে গেল। সেই জ্বালা, সেই প্রাণমনের তৃষ্ণা, সেই জীবনটাকে মুঠো করে ধরবার আগ্রহ—সব কিছু কি এতই দুর্বল ছিল? তাই মিথ্যা হয়ে গেল সব?

সিলেক্ট্-এর সভাতে এখন অন্য মানুষকে, অন্য নতুন প্রতিভাকে নিয়ে মাতামাতি করে সিলেক্ট্-এর নরনারী। সেখানে আমার ছাড়পত্র কোনদিনও ছিল না। তবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন কফিহাউসে গিয়েছিলাম। দেখলাম, সেই পরিবেশ তেমনই আছে। টেবিল ঘিরে বসে ছেলেমেয়েরা আজও বাদপ্রতিবাদে মুখর। জানতে ইচ্ছা হলো, এখন ওরা কি নিয়ে আলোচনা করে।

কফির পেয়ালায় সর পড়ছে, সিগারেটের ধোঁয়ার জাল উড়ছে বাতাসে, দেখলাম তরুণ একটি ছেলেকে ঘিরে কয়েকজন আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। ছেলেটি কখনো ঈষৎ হেসে, কখনো চুলে আঙুল চালিয়ে তাদের কথাবার্তার মাঝে দুটো একটা মন্তব্য করছে। দেখলাম, একটি মেয়ে সপ্রশংস চোখে চেয়ে আছে ছেলেটির দিকে। ঐ ছেলেটি, ঐ মেয়েটি, ঐ পরিবেশ, সবটুকুই আমি জানি, আমি চিনি। দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটায় যেন বেদনা অনুভব করলাম।

দেখে সেই পরিবেশে বিজয়ের কথা মনে পড়লো। বিজয়কে কি এখানেই কেউ মনে রেখেছে? কফিহাউসটা অনেক বছর ধরে কত বিজয় দাশকে দেখলো, কত বিজয় দাশ, কত প্রতিভা, এইখানে, এইসব ছেলেমেয়েদের কথায় আলোচনায় নতুন করে তৈরী হলো, আবার বাতিল হয়ে গেল। উনিশশো আটচল্লিশের বিজয় দাশকে কি তার মনে পড়ে? যখন বাতি নিভে যায়, যখন ক্লান্ত জমাদার

মেঝে আর টেবিল ঝাড়ু দিয়ে সিগারেটের টুকরো জড়ো করে—যখন বেয়ারারা পেয়ালা প্লেট ঝুড়ি বোঝাই করে ধুয়ে ধুয়ে তোলে, তখন কি এই ঘরটার কখনো বিজয়কে মনে পড়ে? না কি কবির সেই কথা শুধুই কবিতা?

'I feel like one, who treads alone
Some banquet hall deserted.
Whose lights are fled,
Whose garlands dead,
And all but he departed—'

তেমন করে, স্মৃতিচারণার মধ্যেও কি বিজয়কে মনে পড়ে না তার?

চলে এলাম। তবু বিজয়কে ভুলতে পারি না। একদিন বিজয় জানত, তাই আমরাও জানতাম, এই পৃথিবীর সবটুকু সৃষ্টি হয়েছে, বিজয়ের অনুভূতিতে, বিজয়ের উপলব্ধিতে স্বীকৃতি পাবে ব'লে। নিজেকে ছাড়িয়ে বিজয় চন্দ্র-সূর্যও দেখতে পেত না।

সেই বিজয় কেমন করে আস্তে আস্তে বাতিল হয়ে গেল। সে দুনিয়া ছাড়বার অনেক আগেই, দুনিয়া তাকে ছেড়ে ছিল। দুনিয়ার চোখে অনেকদিন আগেই মরে গিয়েছিল বিজয়। তার দেহের মৃত্যুটা তাই এমন নির্বিকার ভাবে গ্রহণ করতে পারলো সবাই।

যখন ফিরে আসছিলাম কর্মস্থলে, গাড়ির চাকায় চাকায় যখন অনেক কথা, অনেক শব্দ মুখর হয়ে, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো—তখন বিজয়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, কফি হাউসে দেখা সেই তরুণ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। কাকে ভাবছি? মনকে বুঝবার চেষ্টা করলাম। মনে হলো, ঐ ছেলেটিও নিজেকে আবার নতুন করে জানছে—ঐ পরিবেশে, ভক্তবন্ধুজনের স্তুতিবাদে। জানছে, আর তারও মনে উচ্চাশা আর স্বপ্নকামনার রঙ খুলছে, ধীরে ধীরে,

অজানতে। সেও নিজেকে দেখতে চাইবে, সকলকে ছাড়িয়ে, সব কিছু ছাপিয়ে।

ভাবতে গিয়ে আবার বেদনা বোধ হলো, মমতা হলো। বিজয় দাশরা কাজে লাগে না, কিন্তু তাদের কথা যখনই মনে করব, তখনই কি তাদের জন্য দুঃখ করব না, ভালবাসব না ?

কেমন ক'রে তাদের না ভালবেসে থাকা যায় ? কেমন করে, বিজয়কে, যখনই স্মরণ করব, এখন যেমন করছি, সে স্মৃতিতে মনে মমতা আর ভালবাসা, প্রগাঢ় বেদনার সঙ্গে মিশে মিশে যাবে না ?

বিজয়ের মুখে বহুবার শোনা সেই কবিতা দিয়েই বিজয়ের কথা স্মরণ করবো—

To remember, with love
To remember, with tears.—

এক

বাংলা দেশের সাধারণ ঘরের ছেলে বিজয়। বিজয়ের বাবা গোপালবাবু কুড়ি বছর ধরে একই পাটের অফিসে বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছেন। গোপালবাবুকে আমাদের মনে পড়ে। সবাই বলতো—বড় ভালো লোক।

গোপালবাবুর জীবনটা ছিলো ছকবন্দী। সে জীবনে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। সকালে বাজার করতে যেতেন। দশটার সময় কোটের ওপর চাদর কাঁধে ফেলে যথারীতি অফিস। তিনটি ছেলে, একটি মেয়ে। মাইনে পেতেন বোধহয় একশো কি একশো দশ। পরিবারের বাজেটে চিরদিনই ঘাটতি। সে ঘাটতি পূরণ করবার জন্য বিকেলে অফিস থেকে ছেলে পড়াতে যেতেন। ছেলে পড়িয়ে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে যেত।

তাঁর বাড়িতে মাসের প্রথম দশদিন মাছ হতো। বাকি চলতো নিরামিষ। ইস্কুল থেকে এসে ছেলেরা ভাত খেতো। কালেভদ্রে যদি মাংস রান্না হতো, বা লুচি-পরোটা হতো—সুজয়, কুমুদ আর বেলার মুখ দেখে সে আনন্দের কথা বোঝা যেত।

জোড়াতালি দিয়ে এই সংসারটা টেনে চলবার ক্ষমতা ছিলো বিজয়ের মা-র। উনি তারই মধ্যে নানারকমভাবে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে চেষ্টা করতেন। পুরনো পাঞ্জাবী কেটে গোপালবাবুকে রুমাল বানিয়ে দিতেন। সোডা-সাবান দিয়ে জামা-কাপড় কেচে স্বামী ছেলেমেয়েদের ভদ্রতা বজায় রাখতেন। বিজয়দের বাড়িটা ছিল পুরনো। ভাঙা আস্তরের ফুটোফাটা ঢাকতে ঘরখানা ক্যালেণ্ডারে ভরে ফেলেছিলেন তিনি। ক্যালেণ্ডার আর ছবির ওপর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল তাঁর। যেখানে যা পেতেন, এনে এনে

দেওয়ালে টাঙাতেন। পুরনো শাড়ি রাঙিয়ে জানলায় পর্দা টাঙাতেন—ঘরেই মুড়ি-খই ভাজতেন। ঈষৎ শীর্ণ ছোটখাট মানুষটি—পাতলা চুলওঠা কপালে সিঁদুরের টিপ—ঘুমের মধ্যেও সিঁদুরটিপ তাঁর মুছে যেত না। রক্তহীন, ফ্যাকাশে ফর্সা চেহারা সহনশীলতার প্রতিমূর্তি যেন। বাংলা দেশের বহুলক্ষ মায়ের একজন তিনি।

বিজয়দের পরিবারটাই ছিল শান্ত, ভদ্র। বিজয়ের ভাইবোনেরা পূজায় ভাল জামাকাপড়ের জন্যে আবদার ধরতো না, ম্যাজিক বা সার্কাস দেখতে চাইত না, মিষ্টি বা লজেন্স কিনতে চাইত না—দোকানপাটের পাশ দিয়ে হাঁটবার সময় অন্যদিকে চেয়ে চলে যেতো।

সকলেই বলতো, গোপালবাবু আশ্চর্য শিক্ষা দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের। সুজয় কুমুদ, দুই ভাই—খেলাধুলোর সময়েও কেমন জামাকাপড় বাঁচিয়ে চলতো। তারা যেন শৈশবেই জেনে ফেলেছিল, ধুলাখেলার চাপল্য তাদের মানাবে না।

সমস্ত পরিবারটির কৃচ্ছ্রসাধনের গোড়ায় যেন একটা বোঝাপড়া ছিলো গোপনে। এই সব কিছু তারা যা করছে, শুধু বিজয়ের জন্যে। বিজয় এ পরিবারের ব্যতিক্রম। বিজয়ের বেলা গোপালবাবুর একশো বিশ বা পঁচিশ টাকা মাসিক আয়ের হিসাবটা উল্‌টে-পালটে চূড়ান্ত একটা বেহিসেব হয়ে গিয়েছিল।

বড় ছেলে বিজয়। যেদিন ছাত্র পড়াবার তাগাদা থাকত না, সেদিন গোপালবাবু ছেলেদের নিয়ে বসতেন। সন্ধ্যেবেলা লণ্ঠনের আলোয় মাদুরের ওপর বসে—'ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক—' পড়াতে পড়াতে গোপালবাবুর মনে হতো, জীবনে যা যা করতে পারেননি—সব ইচ্ছা পুরিয়ে নেবেন বড় ছেলেকে দিয়ে। বড় ছেলেই তাঁর সব আশা পূরণ করবে। স্ত্রীকে বলতেন—ওর মাথা খুব। এই বয়সেই ওর মেধা দেখে ওদের মাস্টার আমার

কাছে কত প্রশংসা করলেন। দেখ, ওকে তুমি একটু দুধ দিও। মানে, স্নেহপদার্থ ছাড়া কি মাথার পুষ্টি হয়?

তখন বিজয় সত্যিই ভাল ছেলে। দেখতে ভাল। পড়াশোনায় ভাল। তখন থেকেই আমরা দেখেছি—বাড়িতে তিনখানি ঘর। তারই মধ্যে ছোট ঘরখানায় বিজয় পড়ে। সে ঘরখানা তার আলাদা। বাজার করতেন বাবা, আর অন্য কাজ করতো সুজয়, কুমুদ। ভাইবোনেরা রান্নাঘরে বসে রুটি গুড় খেতো—আর বিজয়কে তার ঘরে এসে গরম দুধ, মোহনভোগ বা পাঁউরুটি—যা তাদের সংসারে প্রায় বিলাসিতা ছিল—পৌঁছে দিয়ে যেতেন মা। সংসারের সঙ্গে বিজয়ের কোন যোগই ছিল না।

সামান্য কিছুদিনই বিজয় পাড়ার স্কুলে পড়েছিল। বিজয়ের মত ভাল ছাত্রকে নিয়ে গড়ে-পিটে মাইনর স্কলারশিপ পাবার একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন তার হেডমাস্টার। বিজয় যে এই বয়সেই আইন-স্টাইনের নাম জানে, আর বাঁচলে পরে সে যে একটা আশ্চর্য ছেলে হবে, এই কথা গোপালবাবুকে শুনিয়ে মাস্টারমশাই অনেক দিনই বিজয়ের বাড়িতে বসে চা-জলখাবার খেয়ে গিয়েছেন ইস্কুল-ফেরতা।

এই সব কথা শুনতেন আর গোপালবাবু স্ত্রীকে বলতেন—দেখ, মাস্টারমশাই তো বি. এ. পাশ—ওঁর কথার একটা মূল্য আছে বইকি! উনি যখন বলছেন—ও তখন হবেই একজন মানুষের মত মানুষ।

নিজে লেখাপড়া বেশিদূর করতে পারেননি বলে বি-এ বা এম-এ পাশ মানুষকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন গোপালবাবু। বলতেন—এ ত' আমার কথা নয়—এ হলো একজন শিক্ষিত লোকের কথা। কত জ্ঞানবুদ্ধি তাঁর।

কিন্তু বিজয়ের একদিন মনে হল—স্কুলবাড়িটা বড় স্যাঁৎসেঁতে—দেয়ালগুলো নোনাধরা—বোর্ডটা ফাটা—ছেলেগুলো যেন ঠিক তার সঙ্গে বসবার যোগ্য নয়। বিজয় বাবাকে জানাল, আর ভর্তি হল এসে আমাদের স্কুলে।

পুরনো স্কুলের হেডমাস্টার এই সুদর্শন ছেলেটিকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন। স্কুল ছেড়ে যখন এল বিজয়, বাড়িতে এসে তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন। বললেন—সেমিনারীই এইসব ছেলের উপযুক্ত স্কুল গোপালবাবু। ভালই করেছেন আপনি। আমাদের স্কুল তার কাছে কি ?

যাবার সময়ে আলোয়ানের তলা থেকে একখানা বই বের করে দিলেন গোপালবাবুকে। বললেন—বিজয়কে দেবেন। বড় ভালবাসে এই সব পড়তে।

সাধারণ জ্ঞানের একখানা ছোট ইংরেজী বই। মাস্টারমশায়ের আন্তরিকতাটুকু স্পর্শ করল গোপালবাবুকে।

আমাদের স্কুলের সুন্দর পরিবেশের মধ্যে এসে পড়তেই বিজয় বেশ সহজ বোধ করল। কেমন করে যেন আশ্চর্য মানিয়ে গেল সে। তখন থেকেই, মনে পড়ে, বিজয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণ করবার ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়েছিলাম। বিজয়ের সব কিছুই ছিল বিশিষ্টতায় ভরা। তার হাঁটা, চলা, কথা কইবার ভঙ্গী—যা দেখতাম, তা-ই মনে হতো বিজয়ের একান্ত নিজস্ব।

সেই বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল কপালের ও চোখের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে—কেমন করে দিনে দিনে বিজয়কে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখলাম।

নতুন ছেলে বিজয় দাশ নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম সকলকে সচেতন করল ইংরেজী ক্লাসে। ইংরেজী সার একদিন বলছিলেন—বড় বড় বীররা, ভয় কাকে বলে জানেন না। কারেজ—আচ্ছা কারেজ কি, তা বলতে পার ? তুমি ? তুমি ?

বিজয় দাঁড়িয়ে উঠে বলল—কারেজ মানে ভয়হীনতা নয়। ভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা, এবং তাকে জয় করে এগিয়ে চলার নামই হলো কারেজ।

—বুঝিয়ে বল, কি বলতে চাইছ ?

—আমি বলতে চাইছি, আঁধার ছাড়া যেমন আলোর প্রয়োজন বোঝা যায় না—পাপের কনট্রাস্ট আছে বলেই যেমন পুণ্যের প্রকৃত মহিমা বোঝা যায়—তেমনই ভয় আছে বলেই নির্ভয় সাহসের মূল্য বোঝা যায়। আমি প্লুটার্কে পড়েছি, যুদ্ধক্ষেত্রে জুলিয়াস সীজার ভয় পেতেন, তবু যেন সেই ভয়ের প্রতিরোধ ভাঙবার জন্যেই সাহসী হয়ে উঠতেন তিনি।

—বীররা ভয় পেতেন বললে তাঁদের ছোট করা হয়, তাই নয়?

—মনে হয় না। জোয়ান অব আর্ক আগুন দেখে ভয় পাননি? সীজার ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপাতে ভয় পাননি? রাজপুত মেয়েরা চিতার আগুন দেখে ভয় পেতেন না? সেই ভয়কে জয় করে, ভয়কে তাঁরা ভয় দেখাতেন। সেইখানেই তাঁদের সার্থকতা।

—সুন্দর বলেছ তুমি, চমৎকার! নতুন এসেছ তুমি? বাঃ—নিজস্ব চিন্তাধারা আছে তোমার! তুমি এগিয়ে এসে বসো। খুব খুশি হয়েছি আমি।

আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরাও এমনি করে ভাবতে শিখবে। বাইরে থেকে জ্ঞান আহরণ করবে। নইলে কখনো শেখা যায়?

শুধু কি ইংরেজী ক্লাসে? বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল—সমস্ত ক্লাসেই নতুন নতুন কথা বলে, নিঃসঙ্কোচে মাস্টারদের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে দিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করে বিজয় নিজেকে একসপ্তাহের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলল।

বিজয়ের কাছে আমার নিজেকে যেন নিষ্প্রভ মনে হলো। সংস্কৃতয় প্রথম হয়ে আসছি বরাবর। মনে হল সেটা যেন অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপার। আমি ইয়েট্সের নাম জানি না। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন দেবতা' কবিতায় কি বলতে চেয়েছেন, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। মনে হল, আমি একটা যা-তা ছেলে। মুখস্থ বিদ্যায় নম্বর নিয়ে চলেছি। আমাদের ফার্স্ট বয় দীপঙ্কর অবশ্য বলল—ওসব

চালিয়াতিতে কিছু এসে যায় না। বাদল, তুই দেখে নিস—ওসব ছেলে সস্তায় বাজিমাৎ করতে চায়। পরীক্ষার সময় সব বোঝা যাবে।

আমি বিজয়কে বললাম—বিজয়, হাফ-ইয়ার্লিতে তোমার ফার্স্ট হওয়া চাই। ঐ দীপঙ্করকে হারানো চাই।

—কে দীপঙ্কর?

বলে বিজয় তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকালো। সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, যাতে আমার মনে হল—দীপঙ্কর এবং তার ফার্স্ট হওয়া—এ সব বিজয়ের কাছে কত অবান্তর। বিজয় একটু হেসে বলল—পরীক্ষা ত' আসুক!

এল পরীক্ষা। রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল দীপঙ্কর যথারীতি ফার্স্ট হয়েছে। ইংরাজী বাংলা ইতিহাসে অবশ্য ভালো করেছে বিজয়। কিন্তু অঙ্কে পাস করতে পারেনি।

দীপঙ্কর বললো—দেখলি ত'? বাদল, তুই ওর সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে অ্যানুয়েলে ঠিক খারাপ করবি। বুঝতে পারছিস না তো?

তর্ক করলাম। বললাম—জানো, আইনস্টাইনও অঙ্ক পরীক্ষায় শূন্য পেয়েছিলেন? বিজয় বলেছে।

—জানিনা ভাই, বড় বড় কথা। সোজা কথা জানি—পরীক্ষায় ভালো না করতে পারলে বাবা আমাকে আস্ত রাখবেন না।

আর কথা জোগাল না মুখে। নিজেদের মধ্যে বললাম—বিজয় হলো একজন জিনিয়াস। ফার্স্ট হবার ওর দরকার কি?

দীপঙ্কর যে এইরকম কথা বলবে সেটা ত' খুবই স্বাভাবিক। তাদের বাড়ির শিক্ষাদীক্ষাই অন্যরকম। দীপঙ্করের বাবা কাকা সবাই ভাল ছাত্র—সরকারী চাকুরে। অর্থ আছে, তাই বলে ছেলেমেয়েদের ওপর শাসনের অভাব নেই।

বিজয় বলল—ও ওর ঐ বাপ-কাকাদের মতই একটা চেয়ারে গিয়ে বসবে আর কি! আই. সি. এস. হতে চেষ্টা করবে। ওসব ছেলের আর ওর চেয়ে বেশি কি হবে?

ভাল করে লেখাপড়া করা, বা ভাল চাকরি করা, বা আই. সি. এস. হওয়া—যে জিনিসগুলোকে এতদিন শ্রদ্ধা করতেই শিখেছি, সেগুলো যে এত তুচ্ছ তা যেন এতদিন জানতাম না। বিজয়ের কথাতে বুঝতে পারলাম।

শুধু দীপঙ্কর নয়, যে সব ছেলে নিজস্ব গুণে বিশিষ্ট ছিল—বিজয় যেন তাদের সহ্য করতে পারত না। এক সৌরজগতে দুই সূর্য থাকতে পারে না—এই নিয়ম অনুযায়ী, বিজয়কে ঘিরে যে গোষ্ঠি গড়ে উঠল, তার থেকে সরে গেল দীপঙ্কর, সায়েন্সের ছেলে পার্থ আর খেলার চ্যাম্পিয়ন সলিল। আমি, প্রণব, অনাদি, অরুণ, দিলীপ—আমরা বিজয়কে ঘিরে রইলাম গ্রহ-উপগ্রহের মত। আমরা এমন করে বেষ্টন করে না থাকলে বিজয়ের যেন অবমাননা হতো।

আমাদের পার্থ, সলিল আর অন্যান্য ছেলেরা বলতো সৌরমণ্ডলী। বিজয়ের সঙ্গে মিশবার জন্য আমরা অন্যান্য বন্ধুদের থেকে খানিকটা দূরে সরে এসেছিলাম। সেজন্যে কখনো কখনো রূঢ় বিদ্রূপও সহ্য করতে হয়েছে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে গেলে সলিল বলেছে-- আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস্? বিজয়ের অনুমতি নিয়েছিস? তার অনুমতি ছাড়াই আমার সঙ্গে কথা বলছিস? না বাদল, বন্ধুর প্রতি তুমি যথেষ্ট বিশ্বস্ত নও।

মনে আঘাত লাগত। কিন্তু বিজয়ের বন্ধু হতে হলে এমনি সব আঘাত ত' সহ্য করতে হবেই। তাতেও যেন আনন্দ আছে, গৌরব আছে। আমরা সাধারণ ছেলেরা তাই ভাবতাম।

ক্লাসের পড়াশোনায় ভাল না হলে কি হয়, বিজয়ের চেহারাটিও হয়ে উঠল সুন্দর। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে স্কুলে আসতো। চটিটা চলতো পায়ের আগে আগে। মাথার চুলগুলো রুক্ষ—তবে তার পেছনে যত্ন ছিল। সামনের চুলের গোছাটা কপালের ওপর দুলতো। কালো ঈষৎ মোটা সোজা ভুরুর নীচে চোখদুটো সতত অস্থির।

ভালো ছেলে অনেক ছিল—বিজয় দাশ আর একটি ছিল না

ইস্কুলে। ইন্‌স্পেক্টর আসবেন জরুরী তদন্ত করতে। হেডমাস্টার ডাকলেন বিজয়কে। বললেন—আবৃত্তি করে শোনাতে হবে।

বিজয় তখনই রাজী। হলঘরে দাঁড়িয়ে, চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে সে তাকাত সামনের দিকে। তাকানোর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো বিজয়ের। সকলকেই দেখছে, অথচ কারুকে যেন দেখতে পাচ্ছে না—এমনই একটা ভাব সে চাহনিতে। তারপর গম্ভীর গলায়, একটা রণন সৃষ্টি করে সে শুরু করতো আবৃত্তি। যখন বলতো—আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে···

মনে হতো চোখের সামনে যেন সে দেখতে পাচ্ছে নিশাচর কোন পাখীর নিষ্ঠুর হত্যালীলা—কথাগুলোর মধ্যে যে যন্ত্রণা ছিল, সেটা যেন ফুটে উঠতো তার গলায়।

যে বিজয়ের এত প্রশংসা—সে কেন পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে পারছে না—এ নিয়ে দুঃখ পেতেন গোপালবাবু। হেডমাস্টারের কাছে এসে মাঝে মাঝে বসতেন। জিজ্ঞাসা করতেন ছেলে সম্পর্কে। হেডমাস্টার বলতেন—বাড়িতে পড়াশোনা করে ?

—বই নিয়েই ত' থাকে।

—আহা, সেটা পড়ার বই কিনা তা ত' দেখবেন আপনি ?

গোপালবাবু হেডমাস্টারকে কিছু বলতে পারতেন না। শুধু বলতেন—কি মাইনেতেই বা রিটায়ার করবো ! ওকে যদি দাঁড় করিয়ে দিতে পারতাম।

গোপালবাবুর জামার হাতা রিপু করা—জুতোটার ক্ষুধার্ত চেহারা যেন কতদিন রঙ খায়নি। ঈষৎ ঝুঁকে বসতেন চেয়ারে। পৃথিবীর সব কিছু, সব মানুষই যে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এমনি একটা বিনয় তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট। দেখে হেডমাস্টারের সহানুভূতি হতো। বলতেন—কি জানেন গোপালবাবু, ছেলেটি আপনার বুদ্ধিমান—ওর বয়স

আন্দাজে বুদ্ধিটা বেশীই বলতে হবে। তবে পাঠ্যপুস্তক পড়া তো দরকার!

পড়া যে দরকার সে কথা গোপালবাবু বুঝতেন। বিজয়কে বলতেন—বাইরের বই পড়া ভাল। তবে মাঝে মাঝে ইস্কুলের বইও পড়া দরকার। হেডমাস্টারমশাইও তাই বলছিলেন···

বিজয় বাবার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকতো—যেন কথাগুলি বুঝতে তার অসুবিধা হচ্ছে। কখনো বলতো—

—আমি বুঝতে পারছি না। এই সব বই পড়া অন্যায়? তাই বলেছেন সার?

—না তা বলেননি বটে···

—ও!—বলে আবার বিজয় হাতের বইখানায় ডুবে যেতো।

যে বোঝে না, তাকে বোঝাবে কে! বিজয় আস্তে আস্তে নিজের প্রেমে পড়তে লাগল। নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা হতে লাগল উঁচু।

তার বাবা-মা তার নাগাল পাবেন কি করে? বিজয় তিনতলার ঘরখানায় থাকতে শুরু করলো। কোন্ কোন্ লাইব্রেরি ঘেঁটে সাহিত্য ও ইতিহাসের বই এনে ভরে ফেলল ঘর। আমরা যখন যেতাম বিজয়ের কাছে—মাসীমা বলতেন—সে ত' পড়ছে বাবা। আস্তে আস্তে যেও ওপরে। ও আবার গোলমাল সইতে পারে না।

মা আর বাবা-র নীরব আত্মদান ছাড়া বোধহয় প্রতিভা সম্ভব হয় না কোনদিন। বিজয়ের জন্যে দেখেছি মাসীমার সে কি আন্তরিক যত্ন। সুজয়, কুমুদ আর বেলার প্রশ্ন তার কাছে অনেক গৌণ হয়ে যেতো। বিজয়ের ভাতে তিনি চোরের মত একটু মাখন ফেলে দিতেন। ভাতের পাতে একটু দুধ এনে দিতেন বাটি ধরে। পাশে বসে অন্য ছেলে দুটি এমনিই খেয়ে উঠে যেতো। মনে পড়ছে, বেলা কেমন এসে দাদার ঘরে চা-এর পেয়ালা নামিয়ে দিয়ে যেতো। সাবান-কাচা জামা-গেঞ্জী রেখে যেতো চুপি চুপি। দশটা বেজে

গেলে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বলতো—দাদা, মা বলল, ভাত হয়ে গিয়েছে। ইস্কুলের টাইম হয়েছে।

তারাও যেন সেই শৈশব থেকেই বুঝে নিয়েছিল, বিজয় তাদের চেয়ে অনেক ওপরে।

ক্লাস টেনে উঠে পূজা সোস্যালে আমরা 'বিসর্জন' অভিনয় করেছিলাম। রাজা সাজলো ইস্কুলের সেরা অভিনেতা হিমাংশু। বিজয় হলো রঘুপতি। রুক্ষ চুল, গেরুয়া সিল্কের চাদর গ্রীক সিনেটর-দের ভঙ্গিমায় কাঁধ থেকে লুটিয়ে পড়েছে—মদগর্বিত উদ্ধত এক আত্মম্ভরীর অস্থির চাহনি। অপূর্ব মানালো বিজয়কে। নাটক মাঝপথে অগ্রসর হতে না হতে বোঝা গেল—রাজমুকুট রঙ্গমঞ্চে হিমাংশু পরলেও দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টি বিজয়ের মাথাতেই পরিয়ে দিয়েছে জয়মুকুট। বিজয়ের সে গৌরব-কিরীটের দীপ্তি হিমাংশুকে ম্লান করে দিল। 'শো' ভাঙলে পরে ম্যাজিষ্ট্রেট-গিন্নী বিজয়কে পরিয়ে দিলেন তাঁর নিজের দেওয়া সোনার মেডেল। বুক ফুলিয়ে উঁচু মাথায় সে সম্মানচিহ্ন গ্রহণ করল বিজয়। হেডমাস্টার চাইলেন ঈষৎ ভ্রূকুটি করে। বিজয় নমস্কার করলো বটে তাঁকে, সভাপতিকে, দর্শকদের—কিন্তু সে নেহাৎ দায়সারা গোছের।

বাইরে এসে দীপঙ্কর বলল—বিজয়, বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলে ভাই, যে রঘুপতির সমুন্নত গর্বিত ভূমিকা ফুরিয়ে গিয়েছে তোমার। হেডমাস্টার আর প্রেসিডেন্টকে তুমি আর একটু ভালভাবে নমস্কার জানাতে পারতে।

বিজয়ের ব্যবহারটা আমাদেরও চোখে লেগেছিল। তবে বলবার সাহস ছিল না। দীপঙ্কর আমাদেরই মনের কথা বললো। বিজয় আশ্চর্য হয়ে তাকাল। বলল—কেন?

—সেটাই খুব শোভন হতো না কি?

—দেখ দীপঙ্কর, মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বিজয় আস্তে

বলল—তোমার আর আমার মতামত একেবারে এক তো নাও হতে পারে! তুমি বলছ আমার আচরণটা অশোভন হয়েছে। কিন্তু আমি বলবো—নিচ্ছি বলেই মাথা নীচু করে নেবো—এটাকে ভাই আমার ভিক্ষুকবৃত্তি বলে মনে হয়। যিনি দিচ্ছেন, তিনিও খানিকটা ধন্য হলেন বৈকি! আমি একাই একেবারে বর্তে যাব—এ রকমটা ত' ঠিক নয়।

আমাদের কানেও যেন বিজয়ের কথাগুলো কেমন কেমন লাগল। দীপঙ্কর আজ আর হাসল না। বলল—বিজয়, তুমি যাই মনে করো, আমি কিন্তু কথাটা তোমাকে খারাপ ভাবে বলিনি। ভালভাবেই বলতে চেয়েছিলাম। যাক—নিজেকে হয়তো বোঝাতে পারছি না। তবে বিজয়, বিদ্যাই মানুষকে বিনয় দেয়। বিনয়ী হওয়ার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। আছে কি?

বিজয় একটু হাসল শুধু। সামান্য হাসি দিয়েই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল দীপঙ্করকে।

সেই সময় থেকেই বিজয়ের মধ্যে এল একটা পরিবর্তন। এতদিন ছিল সে আত্মগত কিশোর। এখন, কৈশোরের যা কিছু সুকুমার, কোমল সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে হয়ে উঠল যা, তাকে মাস্টাররা মনে করতেন বিনয়ের অভাব। বিজয়ের স্তাবক-গোষ্ঠির বাইরে যারা, তারা বলতো—পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

আমরা, যারা বিজয়ের সৌরমণ্ডলীতে গ্রহ-উপগ্রহ—আমরা মনে করতাম যেহেতু সে বিজয়, সেহেতু তার উদ্ধত হওয়াও সাজে। মাস্টারমশাইদের কিছু বলতে পারতাম না—কিন্তু এমন দিন ছিল না, যে বিজয়কে নিয়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গে আমাদের তর্ক না হতো। অরুণ বা অনাদি কথা কইতে পারতো না। ঝগড়া করতাম দিলীপ আর আমি। দিলীপ বলতো—তোমরা বুঝতে পার না বিজয়কে। ঔদ্ধত্য নয় ওটা। ওটা হল ব্যক্তিত্ব।

নিজের সম্পর্কে বিজয়ের আস্তে আস্তে উচ্চ ধারণা হলো।

সে প্রিয় ছিল স্বভাবের জন্য। এখন তার মধ্যে এলো উন্নাসিকতা। সকলে তাকে মানতে চায় না—সে-ও সকলকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হল।

ক্লাসে নেস্‌ফিল্ডের ইংরাজী গ্রামার যেখানে পাঠ্য, সেখানে সে মোটা একখানা গ্রীসের ইতিহাস খুলে বসে থাকে। মাস্টারকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে—গ্রীসের শিল্পে ইজিপ্‌টের প্রভাব কেমন করে এলো?

—সে কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? এটা গ্রামারের ক্লাস।

কোনদিন বা বাংলা টিচারকে বলে—এলিয়ট যে আধুনিক বাংলা কবিতাকে প্রভাবান্বিত করেছেন, তার মধ্যে কি রবীন্দ্রনাথকে ধরা হবে না?

যতীনবাবু বলেন—এলিয়ট আর আধুনিক কবিতার কথা পরে ভাবলে চলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের ওপর রচনায় কতকগুলো ইংরেজী নাম টেনে অযথা পণ্ডিতি করছ কেন?

টিফিনের সময়ে মাঠে বসে আমরা বিজয়কে খাওয়াই। আমরাই যেন ধন্য হয়ে যাই। বিজয় গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে বলে—প্রতিভাবান ব্যক্তি তো সমসাময়িক যুগের স্বীকৃতি পাননি। শেলী বায়রনকে লোকনিন্দা শেষ অবধি অনুসরণ করেছে। মাইকেলের জীবনটা দেখ না। মারা গেলে কবর দিতে মানুষ ছিল না।

ডালপালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে বিজয়ের মুখে। বিজয় বলে—যারা অসাধারণ, তারা কখনও মিশতে পারে না সাধারণ মানুষের সঙ্গে। এই তো কালই পড়ছিলাম সুইনবার্নের কবিতা—। অদ্ভুত কবিতা। মৃতের রাজ্য এক হিমপুরী। সেখানে বসে রয়েছে চিরদুঃখিনী প্রসারপাইন। এ সব পড়তে পড়তে মনটা যে কোথায় চলে যায়···ভালো লাগে? ঐ লাঠি ধরে বাঁদর কেমন উঠছে আর নামছে, সে খবর নিতে?

বিজয়ের কথা শুনি, আর অনাদৃত প্রতিভার দুঃখে আমাদের বুক

ভেঙে যায়। আমরা বলি—বিজয়, তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য কিছু করবে একদিন। সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

বিজয় সামান্য হাসে। বলে—ঐ দারিদ্র্য আর ঐ পরিবেশই আমার মনকে মেরে ফেলবে, জান?

দারিদ্র্য আর পরিবেশ, কথাগুলো বিজয় এমন করে বলতো··· যেন তার চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। সে বিজয়, তাকে ঐ দারিদ্র্যের মধ্যে রাখা যেন তার পরিবারের একটা মস্ত অন্যায়।

অথচ গোপালবাবু দেখেছি, শুধু খাওয়াপরার স্বাচ্ছন্দ্যই নয়, অন্যদিকেও বিজয়কে সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। বোধহয় মনে করতেন তাতে বিজয়ের আত্মোন্নতি হবে।

তিনি ঘুরে ঘুরে এসিয়াটিক সোসাইটি, বা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যে সব বক্তৃতা হতো, তার টিকিট জোগাড় করতেন। বিজয়কে নিয়ে গিয়ে ভাল ভাল জায়গায় জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গ দিতে বড় ভালো লাগতো তাঁর। মনে হতো, এদের দেখে এদের কথাবার্তা শুনে বিজয় যদি নিজের মধ্যে কিছু গ্রহণ করতে পারে—তা হ'লে বিজয়েরই ভালো হবে।

বিজয়-ই একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল।

গোপালবাবু একদিন কালীঘাট থেকে টিউশানী সেরে ফিরছেন। দেখলেন একজন তরুণ ইংরাজকে ঘিরে কয়জন যুবকের ভীড়। কি যেন জানতে চাইছে ছেলেটি, নিজেকে ভাল ক'রে বোঝাতে পারছে না--ফলে বিব্রত হচ্ছে যত, শ্রোতাদের কৌতুকও তত বাড়ছে।

গোপালবাবু তার কাছে গেলেন। ছেলেটিকে বললেন—কি জানতে চাইছ? আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কি?

ছেলেটি বললো—আমি এসেছি একটি ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকদলের সঙ্গে। দলছুট হয়ে এসে পড়েছি মন্দির দেখবার লোভে। শুনছি মন্দির বা শ্মশানঘাটে আমাকে যেতে বা ছবি তুলতে দেবে না।

গোপালবাবু তাকে নিয়ে ঘুরিয়ে মন্দিরের আশেপাশে দেখালেন। ছেলেটিকে গ্র্যাণ্ড হোটেলের নিশানা দিয়ে ট্যাক্সি ধরে দিলেন একটা। ছেলেটি যাবার সময়ে কার্ড দিলো। বললো—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমার স্লাইড লেকচার আছে। তুমি এসো। আমি খুব খুশী হব।

গোপালবাবু বিজয়কে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই সভাতে।

ছেলেটি শুধু শিক্ষকই নয়, খানিকটা ধর্মপ্রাণও বটে। সে বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আমি এসেছিলাম এক ধারণা নিয়ে, অন্য ধারণা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আমার জীবনের আদর্শ হলো, ভারত বা চীন এইসব জায়গায় শিক্ষা প্রচার করা। হয়তো তাই-ই করব। আবার আমি আসব। তবে শিখাতে নয়, আসব শিক্ষার্থী হয়ে। এসেছিলাম সভ্যতার অভিমান মনে নিয়ে। এতদিন জেনে আসছি সভ্যতা ও অন্তরের শিক্ষা যা কিছু আছে তাতে কেবল আমাদেরই অধিকার। এখানকার সব কিছুই অনুন্নত। কিন্তু, আজ আমি স্বীকার করছি, আমাদের সে অভিমান ভেঙে গিয়েছে। আমি যে ভারতকে দেখছি—সে আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বলতে বলতে আবেগে তার কণ্ঠ রণিত হয়ে উঠেছিল। সোনালী চুলে আলো পড়ে ঝলমল করছিল—মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসে সে বলেছিল—

—'I was taught, India is a country of pestilence, superstition, poverty and mud huts. But the civilization that grew out of these mud huts'...

ওকে দেখতে দেখতে, ওর আবেগদীপ্ত কণ্ঠ শুনতে শুনতে বিজয়ের মনকে এক বিচিত্র অনুভূতির মোহজাল ছেয়ে ফেলেছিল।

এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে বিজয় বলেছিল—ওরকম না হলে জীবন!

দীপঙ্কর বলেছিল—বিজয়, আমার জানতে ইচ্ছা করে সেই

সাহেবটির মধ্যে কি তোমার ভাল লেগেছিল, কি তোমাকে মুগ্ধ করেছিল। তার ভক্তি? তার বিনয়? তার নম্রতা?

বিজয় অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিল—ওদের জীবনের কি সীমাহীন পরিসর বল ত'? নিজের দেশ ছেড়ে চলে এসেছে এখানে। ক্যামেরা কাঁধে ঘুরছে। যা ইচ্ছা তাই করছে। মনেপ্রাণে কতখানি স্বাধীন, কতখানি মুক্ত। আমাদের মতো জীবনটা ওদের দুইপায়ে শেকল পরায়নি।

দীপঙ্কর ঈষৎ হেসে বলেছিল—আমি তাই-ই ভেবেছিলাম। ঐ বাইরের দেখাটুকুই তোমাকে মুগ্ধ করবে।

বিজয় বলেছিল—হ্যাঁ, তোমাকে ত' আগেই বলেছি—আমাদের চিরদিন শেখানো হয়েছে, দেশটা বৈরাগ্যের দেশ। শিক্ষাটা নম্রতার ও বিনয়ের। কিন্তু আমার সে দরিদ্রবৃত্তি ভাল লাগে না। জান, নেপোলিয়নের জীবনীতে পড়েছি—Never under-estimate yourself—নিজেকে ছোট ভাবলে কোনদিন বড় হওয়া যায় না।

বলতে বলতে বিজয়ের মুখচোখ যেন জ্বলে জ্বলে উঠতো। কথা বলতে আর ভাল লাগত না বিজয়ের। তার পরিচিত ভঙ্গিতে কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিয়ে সে গভীর স্বরে আবৃত্তি করতো—

—'I strove with none for none was worth my strife''

বিজয়ের চারিদিকে যে দীপ্তিটা বিচ্ছুরিত হতো, তাকে আসল হীরের দ্যুতি বলেই জানতাম আমরা।

তার বাবাও তাই জানতেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, বিজয়কে সবরকমে সুযোগসুবিধা করে দেওয়াতেই তাঁর জীবনের একমাত্র সার্থকতা।

গোপালবাবু একটা ছেড়ে দুটো টিউশনী নিয়েছিলেন। ঘুণাক্ষরেও কি ভাবতে পেরেছিলেন যে, তাঁর এই প্রাণপাত পরিশ্রমের কোন

মূল্যই নেই বিজয়ের চোখে? একচক্ষু হরিণের মত তিনি যে বিজয়ের দিকেই চেয়েছিলেন শুধু। বিজয় বড় হবে—বিজয় নিজের পায়ে দাঁড়াবে—যে বোঝাটার ভারে তাঁর কাঁধ নীচু হয়ে পড়ছে দিনদিন—সেই বোঝাটা সে নিজের সবল কাঁধে তুলে নেবে—এই স্বপ্নই তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল।

তাঁকে এবং আমাদের মর্মাহত করে বিজয় টেস্টে খারাপ করল রেজাল্ট। তার বাবা রাগারাগি করলেন। বললেন—দিনরাত শুনি বই পড়ছ, রেজাল্ট এরকম হয় কি করে? তিরিশ, চল্লিশ, এর বেশী নম্বর পাওনি?

বিজয়ের মা রান্নাঘরে বসে কাঁদতে লাগলেন। বিজয়কে বললেন—পরীক্ষার জন্যে ভালো করে পড় বাবা। তোর বাবা যে বলেন, অনেক দুঃখে বলেন—বুঝতে পারিস না? আজ না খেয়ে চলে গেলেন অফিসে। ঐ রোগা মানুষ।

ভালো করে পাস করে আমরা লজ্জিত হয়ে গিয়েছিলাম। বিজয় আমাদের বলল—টেস্ট দেখে ঘাবড়াস না। দেখিস, ফাইন্যালে টেনে বেরিয়ে যাব।

কিন্তু যত সামান্যই হোক, ম্যাট্রিক একটা পরীক্ষা ত' বটে। বিজয়ের মনটা তখন লম্বা সুতোয় ভর করে আকাশে উড়ছে নানারঙা ঘুড়ির মত। সেই মনকে সুতো গুটিয়ে টেনে আনা কি সোজা কথা? শেরসাহর সঙ্গে আকবরের তুলনা করতে গেলে তার হাসি পায়। বলে—ইতিহাস আজ অবধি লেখাই হয়নি আমাদের দেশে। সত্যিকারের ইতিহাস লিখতে গেলে সত্যিকারের মানুষ হওয়া চাই। ইতিহাস এতদিন অবধি যা পড়েছি আমরা, সবই ত' বিদেশীদের লেখা। আর মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে, ভারতীয়রা কি ইতিহাস লিখেছেন? লিখতে পেরেছেন? যা হয়েছে সবই চূড়ান্ত ছেলে ভোলানো ব্যাপার।

অস্ট্রেলিয়ার খনিজসম্পদ তার মনকে আকর্ষণ করে না।

পাটিগণিতের পাতায়, গজফুট মেপে মেপে যে বাঁদরটা উঠছে আর নামছে তেল-মাখানো লাঠি ধরে, সেটার ওপর তার এতটুকু সহানুভূতি নেই। এক চৌবাচ্চা জলে দশটা নল বসিয়ে পাঁচমণ জল ঢুকিয়ে আবার তিনমণ সাঁইত্রিশ সের জল বের করে দেওয়াটার ব্যাপার মনে হয় পণ্ডশ্রম। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার করুণ বর্ণনা লিখতে বসে শেক্সপীয়রের মিরাণ্ডা আর কালিদাসের শকুন্তলার তুলনামূলক সমালোচনা লিখতে ভালো লাগে বেশী। ফলে যা হবার তাই হল। দ্বিতীয় বিভাগে মোটামুটি পাস করে বিজয় চলে গেল কলেজে।

দুই

কলেজ-জীবন শেষ হতে না হতে বিজয়ের ধারণা হল সে সব রকমে অসাধারণ।

অবশ্য সেজন্য আমরাই দায়ী। আমরা ততদিনে শুধু যে বিজয়কে স্তবস্তুতি করে, তার মধ্যের সুপ্ত প্রতিভাকে খুঁজে খুঁজে নিজেদের অনেক সময় নষ্ট করেছি তাই নয়, আমাদের মতো আরো ভক্ত জুটিয়েছি বিজয়ের। কলেজ-জীবনে নতুন বন্ধুবান্ধব যাদেরই পেয়েছি, বিজয়ের লেখা প্রবন্ধ, কবিতা পড়িয়ে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করেছি তাদের। প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজয় পড়াশোনাতে নাম করতে পারল না বটে—তবে ম্যাগাজিনের সম্পাদক হলো। আর সিম্পোজিয়ম চালাতে, সভা ডাকতে, আবৃত্তি করতে এবং গ্রীক নাটকের ইংরেজী তর্জমার মহলা দিতে—বিজয় ছাড়া কারো গত্যন্তর রইল না। নতুন ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতো বিজয়ের দিকে। বলতো—ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল রেবেল একটা বিজয় দাশ!

তবে কলেজ ছাড়বার সময়ে দলটা ভেঙে গেল।

অনাদি আমাদের দল ছেড়ে গিয়ে ভর্তি হল আর্ট স্কুলে। বিজয় বলল—তুমি যদি আঁকতে চাও, আঁকতে পারো অনাদি—কিন্তু যে স্পার্কটা ভেতরে থাকলে মানুষ হয় জাতশিল্পী—সেটা তোমার নেই। ঐ হাজার জনের একজন হয়ে ক্যালেণ্ডারে তেলের বিজ্ঞাপন করতে হবে। ভাবলেই অসহ্য লাগে।

অনাদি মৃদু হাসল। বললো—সেই হবো, যদি বরাতে থাকে।

—বরাত মানে? ভাগ্য? ভাগ্য তুমি মানো অনাদি?

—নিশ্চয়। আমি ভাগ্য মানি বইকি!

—আমি মানি না। আমি ভাগ্যের অধীন হব না, দেখো। ভাগ্যকেই আমি পদানত করবো।

অনাদি সরে গেল। আমরা যারা কোনদিনও ভাগ্যকে পদানত করতে পারবো না—হতে পারব না বিজয় দাশ—আমরা নিশ্বাস ফেলে আদাজল খেয়ে পড়াশোনা করতে লাগলাম। প্রণব ইকনমিকস্‌-এ ভর্তি হল। আমরা বললাম—বিজয় অনেক ত' হলো, এবার এমন একটা কিছু কর···

বিজয় সেই স্বল্প হেসে থামিয়ে দিলো আমাদের। সবাই পেছনে থাকবে, সে এগিয়ে যাবে। সবাই সাধারণ ভাবে বড় হতে চায়, সে করবে একটা কিছু চমকপ্রদ—এই তার পণ। এ বাজি ফেলতে কেউ জোর করেনি তাকে। নিজের সঙ্গে নিজেই বাজি ফেলল বিজয়। ফলে তার অবস্থা দাঁড়াল কোন হতভাগ্য রেসের ঘোড়ার মত। এ রেস তার সারা জীবনেও শেষ হয়নি। এ রেস স্টার্ট করে দিয়েছিলো যে নির্মম কৌতুকে, সে আর থামতে দেয়নি বিজয়কে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকে ইতিহাসে অনার্স নিয়েছিল বিজয়। বলাবাহুল্য সে অনার্স পায় নি। ভর্তি হল গিয়ে ইংরেজীতে।

এমনি সময় গোপালবাবু আনলেন তার চাকরির খবর। ব্যাঙ্কের চাকরি। ঢুকতে হবে ক্লার্ক হয়ে। তারপর পরীক্ষা দিতে দিতে স্বচ্ছন্দে সে উন্নতি করতে পারবে।

গোপালবাবুর ইদানীং রক্তের চাপটা বেড়েছে। বড় ছেলে মানুষ হবে, এই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে তিনি শ্রম করেছেন বিশ বছর ধরে। গত সাত বছর আছেন এক্সটেনশন-এ। বাড়ি ফিরে তিনি স্ত্রীকে বলেন—চাকরি আর বুঝি থাকে না। ওদেরই বা কি বলি বলো! কতদিনই বা ঠেলবে!

চাকরি না থাকলে কি হবে ভাবতে গিয়ে হাতের ডালমাখা ভাত শুকিয়ে যায়। মুখে গ্রাস তুলতে ভুলে যান গোপালবাবু। বিজয়ের মা-র চোখের সামনে যেন হারিয়ে যায় সব কিছু। ঝোল তুলতে

গিয়ে হাতটা শূন্যেই থেকে যায়। ঝোলের বাটিটা যেন দেখতে পান না তিনি। গোপালবাবু বলেন—বড়বাবুর চিঠি নিয়ে ধরেছি তাঁর ভায়রাকে। সেই অবিনাশবাবুর কথা বলছি। কথা দিয়েছেন, হয়ে যেতে পারে ওর চাকরিটা।

শুধু ভায়রাভাইয়ের চিঠি নিয়ে সুপারিশ করলে অবিনাশবাবু শুনবেন বলে ভরসা ছিল না গোপালবাবুর। অগত্যা উপঢৌকনে মন ভেজাতে চেষ্টা করেছেন। সন্দেশের বাক্স পৌঁছিয়ে দিয়ে, নিজের শরীরের অবস্থা, আর বিজয়ের একটা চাকরির দরকারের কথা বারবার বলেছেন। অনেকদিন এমনি বসে বসে চলে আসতে হয়েছে। বড় ব্যাঙ্কের এজেন্ট অবিনাশবাবু। দেখা করতে সময় পান নি। তবে অবিনাশবাবু মানুষটি ভালো। গোপালবাবুর কথা তাঁর মনে ছিল। তাই শেষ অবধি মনে হল হয়ে যাবে কাজ।

গোপালবাবু সেদিন উৎসাহে বেহিসেবী হয়ে মাছ কিনে ফেললেন একটা। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে ডাকলেন জোর গলায়। বললেন—তাড়াতাড়ি কুটে ফেল। বেশ ভাল মাছটা।

সুজয়কে বললেন—দাদা কোথায় তোর ?

বাড়িতে ছিল না বিজয়। গোপালবাবু বললেন—এলেই পাঠিয়ে দিস আমার কাছে।

কফি হাউসে সেদিন জমেছিলো সাহিত্য-বাসর। তর্ক করছি আমরা। সবিতা, তপতী, সুচরিতা—সকৌতুকে যে দেখছে আমাদের সেটা জেনে তর্কটা জমিয়ে তুলতে আরো ভালো লাগছে। বিজয় শুনছে সকলের কথা। মাঝে মাঝে সংশোধন করছে—র‍্যাঁবো—মালার্মে প্রুস্ত...আর কবিতা লিখছে। কফি হাউসের ভীড়ে বসে যে নতুন গ্র্যাজুয়েট খালি পেটে কড়া কফি আর মগজ ভরে সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে কবিতা লেখে না, সে নাকি জাতেই ওঠে না।

মেয়েরা বিজয় দাশকে শ্রদ্ধা করতো, ভয় পেতো, কিন্তু বন্ধুত্ব করতো আমাদের সঙ্গে। বিজয়কে লক্ষ্য করে অন্তত একটি মুগ্ধ হৃদয়

ভয় ভক্তি প্রেমের মিশ্র কুসুমের অঞ্জলি ঢেলে দিতো পায়ে—সে কথা বিজয় না জানলেও আমরা জানতাম। প্রেসিডেন্সীর ভালো মেয়ে মাধবী—নরম সরম সুশ্রী, লাজুক স্বভাবের মেয়ে—সে বিজয় দাশকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। আমাদের সে কফি হাউসের আড্ডায় মাধবীও ছিল। মাধবী চিবুকের তলায় আঙুল রেখে চেয়েছিল বিজয়ের দিকে। সে দৃষ্টি অনুভব করেই হয়তো বিজয় মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে চুপ করে যাচ্ছিল।

সেই আমরা প্রথম জীবনের স্বাদ পাচ্ছি। কফির টেবিলে তর্কটা আমাদের ফ্রান্সের সাহিত্য থেকে জাপানের শিল্পশৈলী পর্যন্ত সবটুকু নিয়ে চলতো। একেই বোধহয় বলে সাতসমুদ্র তেরোনদী পাড়ি দেওয়া। তরুণ বয়সে আমাদের মনই এক অজেয় পক্ষীরাজ। সে মনে সওয়ার হয়ে লম্বা পাল্লা দিতে আমাদের খুব ভালো লাগছে।

কিছুক্ষণ বাদে আমরা বিজয়কে ধরলাম—বিজয় কি লিখলে শোনাও।

বিজয় নিজের লেখা কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে হঠাৎ আবৃত্তি শুরু করলো—

'The crawling glaciers pierce me with the spears
Of their moon-freezing crystals, the bright chains
Eat with their burning cold into my bones.
Heaven's winged hound, polluting from thy lips
His beak in poison not his own, tears up
My heart; and shapeless sights come wandering by...'

বলতে বলতে বিজয় হঠাৎ থেমে গেল। বললো—শেলীর মতো এ রকম একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব দেখা যায় না। চেতনার এবং বুদ্ধির যে মুক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—শেলীর মধ্যে তার পূর্ণ বিকাশ। জানো, এই 'Prometheus unbound' লিখতে বসে তিনি কি বলেছেন? ভূমিকাটা প'ড়ো। বুঝতে পারবে।

বাড়িতে যখন ফিরেছিল বিজয়, তখনো তার মনে সেই সব কথার উত্তপ্ত আমেজ লেগে আছে।

মা যে একখানা ধোয়া শাড়ি পরে ভালো করে চুল আঁচড়িয়েছেন—বাবা যে টিউশনীতে না ছুটে আজ তার সঙ্গে খাবেন বলে বসে আছেন—সে সব কোনদিনই চোখে পড়েনি বিজয়ের। সেদিনও তার খেয়াল ছিল না।

খাবার সময়ে বাবাকে পাশে দেখে কিছুটা আশ্চর্য হল। খেতে বসে কথা বলে না বিজয় কোনদিনও। সেদিনও সে চুপচাপ খেয়ে উঠে যাচ্ছিল। বাবা বললেন—কথা আছে, বসো।

বসল বিজয়। গোপালবাবু বললেন—বি. এ. তো পাস করলে। তেমন রেজাল্ট হলো না। যা হোক চাকরির ব্যবস্থা করেছি একটা। ব্যাঙ্কের কাজ। এ কাজ নতুন গ্রাজুয়েটের পক্ষে মেলা সম্ভব নয়—তবে নেহাৎ অবিনাশবাবু ছিলেন পেছনে, আর তোমার ইকনমিক্স্ ছিলো—তাই সম্ভব হল। নইলে আর হতো না। বলো কি, অবিনাশবাবু বললেন—গোপালবাবু, ইওর বয়···সে যা প্রশংসা করলেন!

—আমি? ব্যাঙ্কে চাকরি করবো?

—হ্যাঁ। চমৎকার কাজ। তিন বছর বাদ পরীক্ষা দেবে, তাহলেই তোমার গিয়ে একশো ষাট টাকার স্কেলটা পাবে—মন্দ কি বিজয়?

—তুমি কথা দিয়েছো?

—কথা দিয়েছি মানে? এতবড় ব্যাঙ্কের কাজ—শুধু লণ্ডন শহরে ওদের তিনশো ব্র্যাঞ্চ আছে, জানো? পৃথিবীর সবকিছু রসাতলে যাক—এসব ব্যাঙ্কের মার নেই কোনদিনও। কে পাচ্ছে বিজয়? খুব ভাগ্য তোমার···

—কিন্তু আমি তো ব্যাঙ্কের চাকরি করবো না বাবা।

—চাকরি করবে না?

—না, আমি ইংরেজীতে ভর্তি হবো। ফর্ম নিয়ে এসেছি।

বাপ আর ছেলে ছ'জনে ছুই ভাষায় কথা বলেন। এর কথা উনি বোঝেন না। ওর কথা বুঝতে এঁর কষ্ট হয়।

গোপালবাবু সব ভুলে যান। গলাটা তাঁর পর্দায় পর্দায় চড়তে থাকে—চাকরি করবে না? মাস গেলে একশো চল্লিশ টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—পোষাচ্ছে না তোমার? পড়বে? পড়ে করবে কি?

—সে তুমি বুঝবে না।

—পড়ে পড়ে ঐ তো বছরের পর বছর যা রেজাল্ট করছ। তোমার ওপর আমি অনেক আশা করেছিলাম বিজয়···সে যাক্ গে! এম. এ. তোমাকে পড়াই—সত্যিই আমার সে সাধ্য নেই।

—বেশ, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো তবে···

—কিন্তু বিজয় তুমি এমন স্বার্থপর হবে তা তো আমি ভাবি নি। আমার সাধ্যমত যা করতে চেয়েছো—করেছি! আমার চাকরি আজ-কাল খতম হয়ে যেতে পারে—সুজয় কুমুদ টিউশনী করে পড়ছে—ওদের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, তাই কি চাও তুমি?

বিজয় তাকাল তার বাবার দিকে। সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে যেন বিঁধে বলল—চাকরিতে ঢোকা মানে সমস্ত জীবনটা নষ্ট করা ত'? পারব না আমি। সুজয় কুমুদ পড়তে চায় পড়ুক না—আমি তো ওদের মানা করিনি। লেজার খুলে বসে হিসেব করা দিনের পর দিন? অসম্ভব।

—অসম্ভব?

গোপালবাবু এমন করে চেয়ে রইলেন, যেন বিজয়কে এই প্রথম দেখছেন। বললেন—

—আমার অবস্থায় তোমাকে এম. এ. পড়ানো কতখানি অসম্ভব, সে কথা ভেবে দেখেছ কোনদিন? তুমি যখন যা করতে চেয়েছ, কোনদিন বাধা দিয়েছি আমি? এটা তুমি বুঝলে না, যে আমি পারছি না আর? তোমার ওপর আমার অনেক আশা, অনেক

ভরসা ছিল বিজয়! সে কথাও ছেড়ে দিই। সুজয় পড়াশোনায় ভাল, সত্যিই ভাল—ওদের জন্যেও ত' তোমার ভাবা উচিত? তুমি তো বড় ভাই?

—আমি পারব না।

ব'লে থালার ওপর হাত ধুয়ে ফেলল বিজয়। অভুক্ত মাছভাত পড়ে রইলো। বিজয় উঠে গেল।

গোপালবাবু ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি যে এমন স্বার্থপর, এমন আত্মসুখী হবে, তা আমি কোনদিনও ভাবিনি বিজয়। বুড়ো বাপ বলছে যখন—তার কোন কারণ আছে কি না তা-ও তুমি ভাববে না? আমি যদি আজ না থাকি? তোমার ভরসায় এদের রেখে যাব? তুমি এদের দেখবে?

বিজয় ততক্ষণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। বাবার কথাগুলো তার কানে গেল না।

বিজয়দের সংসারে এমন অশান্তি আর কোনদিনও হয়নি। নিচ থেকে গোপালবাবুর কথাগুলো ওপরে গিয়ে ধাক্কা মারছিল। শুনে বিজয়ের ভাইবোনেরা ভয়ে সিঁটিয়ে বসে রইল। বিজয়ের মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছিলেন। মর্মাহত গোপালবাবু শেষ শেলটা স্ত্রীর বুকেই হানলেন। উদ্‌ভ্রান্ত গলায় বললেন—কাঁদছ? কেঁদ না—এখনই কেঁদ না। ঐ ছেলে তোমাকে কত কাঁদাবে। এখনই তার হয়েছে কি! সবই বাকি আছে।

—আর বলো না!

—না, এই চুপ করলাম। তবে ভুল করেছি আমিও। ছেলে হয়ে বাপের দুঃখ বোঝে না—সে বাপের বুকখানায় কি হয়ে যায় ভাবতে পার? আমাকেই নতুন করে কাজের সন্ধান করতে হবে। কি করবো! আমি বাপ, আমি তো ফেলে দিতে পারি না।

বিজয় এ চাকরি করবে না—এম এ-তে ভর্তি হবে—এই শৌখীন

স্বপ্নবিলাসের কথা বলতে মাথা কাটা গেল—তবু অবিনাশবাবুকে কথাটা বলতেই হল গোপালবাবুর।

অবিনাশবাবু শ্লেষ করলেন না বা রেগে উঠলেন না। চশমাটা মুছে তাকালেন ভাল করে গোপালবাবুর দিকে। বললেন—এমন করে মাথা খেয়েছেন কেন? ছেলের ওপর শাসন নেই কেন আপনার? অনার্স নয়, ডিস্টিংশন নয়—এমন মামুলি ছেলে এম-এ পড়তে চায় কেন? না গোপালবাবু, আপনি রাশ টানতে পারেন নি।

গোপালবাবু যেন এক রাতে আরো কোলকুঁজো হয়ে বুড়িয়ে গেছেন। তিনি নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বলবার কিছু ছিল না তাঁর।

পরদিন সকালে বিজয় আমাদের আড্ডায় এল। চাদর গায়ে—কপালে ভ্রূকুটি। অনেকদিন পরে যেন অসুখী, অতৃপ্ত রঘুপতির ভূমিকায় দেখছি তাকে। বসে পড়ে বলল—মধ্যবিত্ত সংসারগুলো একটা অভিশাপ।

—কেন?

—কাল শুনলাম, এম-এ পড়া চলবে না—চাকরিতে ঢুকতে হবে আমাকে।

—কি চাকরি?

—লয়েড্‌স ব্যাঙ্ক।

—এখুনি ঢুকে পড় বিজয়। বলছ কি, চান্স পেলে আমিই নিয়ে নিই।

—নাও গিয়ে প্রণব—আমার লোভ নেই। বর্তমানে ব্যাপার হচ্ছে, তোমরা আমাকে টিউশনী জোগাড় করে দাও।

—কি বললে?

সমস্বরে চ্যাঁচালাম আমরা। বিজয় দাশ টিউশনী করে পড়বে? এর চেয়ে অবাস্তর কথা যে শুনিনি জীবনে।

বিজয় বললে—নইলে যে পড়াটি বন্ধ হয়ে যাবে আমার।

বুঝছ না? এমন হয়ে গেল মেজাজটা—আমেরিকান আর্কিটেকচারের উইজার্ড ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখছিলাম একটা—স্টেট্‌স্‌ম্যানের জন্যে! বন্ধ করতে হল।

—সে কি, আমাদের বলনি ত'?

—বলবার কি আছে? অবশ্য কাগজগুলো যা, ছাপলে হয় লেখাটা।

আলোচনাটা তারপরে অন্যদিকে চলে গেল। কোন দেশ থেকে কোন ভাবধারা কোন দেশে গেল তারই ইংরিজী ফরাসী টিকা-টিপ্পনী দিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা। নানারকম কথা।

আড্ডা ভাঙলে পরে সবাই চলে গেল যখন, তখন অরুণ বলল—বাদল, শেষ অবধি পড়তে পারবে না বিজয়? এটা কি উচিত হবে?

—কি করা যায় বলো?

—আপাতত আমি আর দিলীপ দেখি—তারপর···দিলীপের চেনা ঐ যে সুরঞ্জনা মেহতা না কে আছে না? যার বাবা চেম্বার অফ্ কমার্সে আছেন। তাদের বাড়িতে লাগিয়ে দিলে হয়। মন্দ কি?

—কি করবে বিজয় সেখানে?

—আহা, বাঙালী বনে গিয়েছে তো! কালচারের বাতিক আছে। বিজয় না হয় সুরঞ্জনাকে সাহিত্য পড়াবে।

যার কেউ নেই, তার দিলীপ আছে। দিলীপের খোলামেলা স্বভাব। বাপ ছিলেন এ. জি. বেঙ্গল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আছে বলে দিলীপ আমাদের কাছে চিরদিনই কিছুটা লজ্জিত। কিছুটা সংকুচিত থেকেছে। গাড়ি দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে হেঁটে ইস্কুলে এসেছে। শার্টের কলার থেকে বিলিতী দোকানের ছাপমারা কাপড়ের টুকরো সযত্নে ব্লেড দিয়ে কেটে তবে সে জামা পরেছে। দিলীপের মনটি বড় সাদা, গঙ্গাজলের মত, আর তার যে টাকা আছে সে যেন একটা অপরাধ। সেই অপরাধ স্খালন করেছে সে বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজনে অজস্র খরচ করে। বিজয়ের ধারে-কেনা

বিদেশী বইয়ের দাম দিয়েছে দিলীপ। আমাদের চা-কফির বিলও সে-ই মিটিয়েছে।

আজ তাই অরুণের দিলীপের কথাই মনে পড়ল। অরুণের কথা আলাদা। অবস্থা তেমন নয়—সে টিউশনী করেই চালায়। তবে সে গানের টিউশনী। ছোটখাটো জলসায় গান গেয়ে অরুণ মরশুমে দশবিশ টাকা রোজগারও করে। অরুণকে আমি বললাম—দিলীপ না হয় সাহায্য করবে। তুমি কি করবে?

—আহা, বুঝছ না কেন? বিজয়ের পড়া হবে না—সে প্রশ্নের কাছে আমি কি করবো না করবো, সেটা অনেক অবান্তর নয় কি? ভর্তি ত' হোক—তারপর দেখা যাবে।

অরুণ ঐ রকমই। চুপচাপ মানুষ। বেশি কথা কইতে ভালবাসে না। তবে মনের জোর আছে তার। ঐ চুপচাপ স্বল্প কথা কওয়া ছেলেটির মধ্যে একটা পৌরুষের দৃঢ়তা আছে। সে যারা তার সঙ্গে ভাল করে মিশেছে—তারাই জানে।

এমনি করে ভর্তি হল বিজয়। গোপালবাবু চাকরি ছেড়ে আর একটা কাজ নিলেন। এ কাজ প্রেসের কাজ। প্রেসের খাতা লেখা, সে-ও কম খাটুনীর ব্যাপার নয়। কয় মণ, কয় সের নিউজ প্রিণ্ট, বর্জাইস বা পাইকা টাইপ এল, তার হিসেব লেখার কাজ। প্রেসের ঘরে আলো আসতে চায় না। আন্তিকালের নীচু ছাতের এক ঝুরঝুরে বাড়ি। চারিপাশে একটা চাপা ভাব। নিশ্বাস নিতে চাইলেও বুঝি নিশ্বাস মিলবে না। কাজ করতে করতে গোপালবাবু যেন স্পষ্ট দেখতে পেতেন—তাঁর আঙুল থেকে কলমের ডগায় যেমন কালো লাল অঙ্কগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে—তেমনি করেই তাঁর আয়ুও ঝরে পড়ে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরতে মাথা টিপ টিপ করতো—পায়ের তলায় যেন বেড়ালে আঁচড়াচ্ছে এমনি বোধ হতো। পিঠ যেন ভেঙে পড়তে চাইতো।

গোপালবাবু কিন্তু আর কোনদিন বিজয়কে রোজগারের কথা বলেননি। বিজয় তাঁর সে ক্লান্তি, সে পরিশ্রমের কথাও জানতো না।

গোপালবাবুকে চিনতে ভুল করেছিলো বিজয়। কোনখানটায় যে তিনি সমুন্নত মাথা, আত্মমর্যাদায় দীপ্ত, সেটা সে বোঝেনি। সে তাঁর পরাজয় ও হতাশার দিকটাই দেখেছিল। তার চোখে তার বাবা ছিলেন বহুলক্ষ মানুষের একজনমাত্র, যারা সাধারণ, অতি সাধারণ হয়ে বেঁচে থাকে—কেননা তাদের আর কিছু করবার নেই।

এইসব সাধারণ মানুষদের বিষয়ে বিজয়ের একটা প্রিয় মন্তব্য ছিল। কারুকে ভাল বললে সে বলতো—দেখ ওদের ভাল হওয়ার মানে কি জান ত'? খারাপ হবার ক্ষমতা নেই, তাই লোকটা ভাল হয়ে আছে। অর্থাৎ ওর মধ্যে কোন রকম গুণপনাই নেই। ও ভাল হওয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই।

সাধারণ মানুষদের বিষয় সে বলতো—

—ওর মধ্যে অসাধারণ হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সাধারণ না হয়ে ওর উপায় কি? দেখ, যদি ইচ্ছাপূরণ হতো, তা হলে সব কাঁচই হীরে হতে চাইতো।

তার বাবা সম্পর্কেও তার ঠিক তেমনিই ধারণা ছিলো। কোন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব নয়, চেষ্টাকৃত কোন অবহেলা নয়, বাবাকে তার চোখেই পড়তো না।

চেহারায়, অভ্যাসে, স্বভাবে, এত সাধারণ ছিলেন গোপালবাবু, যে বিজয় কোনদিনই তাঁর সম্পর্কে বিশেষ করে ভাবেনি।

নিজেকে নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতো সে, নিজের ঔজ্জ্বল্যে এমনই চোখ ভরে থাকতো তার যে গোপালবাবু যে দিনদিন আরো শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন, গলার হাড়টা যে এত ঠেলে উঠেছে, আজকাল যে অফিসের পরেও বাড়ি ফেরেন না, বা ফিরলেও আগেকার মতো কথাবার্তা বলেন না—এসব সে লক্ষ্যই করেনি।

গোপালবাবু প্রথম দিকটায় না পারলেও তারপর থেকে বিজয়ের মাইনের টাকা জুগিয়ে গিয়েছেন। তেতলার ঘরে চা, দুধ, খাবার— ঠিকই পৌঁছে দিয়েছে বেলা। ইদানীং শুধু একটা পরিবর্তন ঘটেছিল গোপালবাবুর। প্রায়ই তিনি গিয়ে বসে থাকতেন পার্কে। রাতের টিউশনী সেরে। ফাঁকা বাতাস, অন্ধকার মাঠ, বড় ভালো লাগত তাঁর। মনে হতো, শুধু বসে থেকে যে এত শান্তি পাওয়া যায়, তা কেন আগে জানেননি।

সুরঞ্জনা মেহতার বাড়িতে সে সাহিত্যের টিউশনী শেষ অবধি আর করা হয়নি বিজয়ের। তাদের বাড়ির পরিবেশ তার ভালো লাগেনি।

তিন

ইউনিভার্সিটির গেটটা দিয়ে ঢুকতেই কাঁধ টান হয়ে যায়, বুক ফুলিয়ে ঢোকে নতুন পোস্টগ্রাজুয়েটের ছেলে। আমরা তাদেরই দলে। ইউনিভার্সিটির জীবনটা নেশা ধরালো আমাদের চোখে। ছাত্রজীবনটা শেষ হয়ে আসছে—বৃহত্তর জীবনের আহ্বান এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে, ছেড়ে যেতে হবে বলেই হয়তো এই বেপরোয়া দিনগুলো এত ভাল লাগে।

ইউনিভার্সিটির সেই দিনগুলির কথা কখনো কি ভুলব? দিন-গুলো যেন পাখা মেলে উড়ে যায়। আমরা ত' বিজয় নই। আমরা সাধারণ ছেলে। সাধারণ রুচি আমাদের। অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে সিনেমা দেখি ক্লাস পালিয়ে। খেলাধুলা করি। মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি, বন্ধু-বান্ধবরা কেউ যদি প্রেম করে, ত' তাকে সবরকম সুযোগ করে দিই। এ সময়ে হৃদয়ে হৃদয়ে পরিচয় যত হয়, আবার ভাঙাও লাগে তত। ভগ্নহৃদয় প্রেমিক বন্ধুকে আশা ভরসা দিই—সে-ও একটা কাজ আমাদের।

রাজনীতির আকর্ষণই কি কম? বেঞ্চির ওপর লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বক্তৃতা দেয় আমাদের দীপঙ্কর। নেমে এসে বলে—হাকিমগিরি করতে হবে ভাই, চেঁচিয়ে গলার জোর বাড়াচ্ছি।

রাজনীতিকে এমন হালকা ভাবে নিতে দেখে তপন রেগে যায়। তপন আমাদেরই অরুণের ভাই। এক্লাস জুনিয়র। বলে—সবকিছু তোমরা হালকা করে ফেল বলেই ত' জীবনের প্রতি পদে হটে যেতে হচ্ছে। ঠাঁই পাচ্ছ কোথাও?

তপন গলা ফাটিয়ে মাইক ধরে বক্তৃতা দেয়—বন্ধুগণ!...

আমরা ইউনিভার্সিটির দেয়ালে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে পোস্টার এঁটে বেড়াই।

বিজয়কে পাই না আমাদের মধ্যে। ভর্তি হয়েছে ইংরেজীতে—কিন্তু বইপত্র যা নিচ্ছে সব ফিলজফির। সবিতা রায়ের কৌতূহল সব বিষয়েই। চশমা পরা, শ্যামলী ছিপছিপে মেয়েটি সর্বদা ছটফট করে বেড়াচ্ছে। সে-ই খবর আনে। চিনেবাদাম খেতে খেতে বলে—তোমাদের বিজয় দাশ-এর জন্যে আমরা একটা বই পাচ্ছি না জানো? যত রেফারেন্সের বই সব ওর কাছে।

—নিচ্ছে কি করে?

—কেন, কালিদাসের মালিনী ছিল না? বিজয় দাশকে বই এনে দিচ্ছে আমাদের মাধবী। সেদিন কি তর্ক জানো না—বলল বিজয় দাশকে নাকি আমরা বুঝতে পারি না। ভুল বুঝে অবিচার করি। বলল, জানি ছেলেরা হাসাহাসি করে। কিন্তু আকাশের মুখে হাউই ছাই দিতে চাইলে যে অবস্থা হবে—এ-ও ঠিক তাই। বিজয়কে যারা ছোট করতে চাইবে, নিজেই তারা অপমানিত হবে।

মাধবী এত কথা বললো? শুনতে শুনতে আমাদের মধ্যে অরুণের মুখখানাই যা সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আমাদের এইসব হাসি খেলার হালকা কথাবার্তার আড়ালে প্রেমের মঞ্জরী বিকশিত হচ্ছিল কোথাও, আমরা সে-কথা জানতাম না। বুঝতে পারিনি যে গোপনে, নিঃশব্দে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছিলো কোন মন-প্রাণ।

এখন মনে হয়, কেন বুঝতে পারিনি তখন—সব লক্ষণই তো পরিস্ফুট ছিলো? কুয়াশা ছিল না কোথাও। তবু কেন বুঝিনি? সে বোধ হয় অল্পবয়সের মূঢ়তা। জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার ফল।

অরুণ আমাদের ছোটবেলার বন্ধু। স্বভাবের মাধুর্য যদি মানুষের একটা গুণ হয়, তবে অরুণ সত্যিই গুণী। মনপ্রাণের এত ঐশ্বর্য সচরাচর দেখা যায় না। অরুণ তেমন স্বচ্ছল ঘরের ছেলে নয়। কিন্তু

বন্ধুদের প্রয়োজনে সে চিরদিনই অবারিত ভাবে দিয়েছে। সে-ও নীরবে, কুণ্ঠিত ভাবে—যেন কেউ না জানে। যেমন হলো বিজয় ভর্তি হবার সময়ে। দিলীপ বলল—হাতে এখন ঠিক পুরো টাকাটা নেই। গোটা পঁচিশ টাকার জন্যে ঠেকে গেলাম।

—পঁচিশ টাকা?

অরুণ জিজ্ঞাসা করলো শুধু—কিছু বলল না। কিছুদিন বাদে সে এনে দিলো টাকা—কিন্তু তার শখের ফরমায়েস দিয়ে করানো তবলা জোড়া বিক্রী ক'রে। কেউ সে-কথা জানতো না, যদি না তপন হৈ-চৈ করতো। তপন অরুণের থেকে ছোট হলেও দাদার প্রতি তার একটা মমতার ভাব আছে। তার দাদা খানিকটা অসহায়, নিজের কথা সে প্রাণ থাকতে মুখ ফুটে বলবে না—অথচ তাকে খানিকটা রক্ষা করাও দরকার—এই ছিল তার মনোভাব।

তপনের কথায় দিলীপ চটে গেল। বললো—লালবাজারের গলিতে বসে ফরমায়েস দিয়ে যে তবলা জোড়া বানালি, সেইটে বিক্রী করেছিস? তুই একটা বোগাস্!

অরুণ শুধু বললো—বুঝতে পারছ না কেন, নইলে আমার তানপুরাটা বেচতে হতো। তা পারব না। ভুবনবাবু বুড়ো হয়ে গিয়েছে, অমন তানপুরা আর কেউ বানাবে না।

অরুণের স্বভাবটা চিরদিনই চুপচাপ। মনটি স্পর্শকাতর। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে দূর থেকে। তার এই স্বল্পভাষণ বা সংযত ব্যবহারের মধ্যে কোন আত্মপ্রচার নেই।

ভালো গান গায় বলে অরুণ সহজেই জনপ্রিয় হতে পেরেছে ছাত্রদের মধ্যে। বর্তমানে শিখছে কোনো গুণী সঙ্গীতজ্ঞের কাছে। তিনি ওকে স্নেহ করছেন বলেই জলসা ও আসরের ছাড়পত্র কিছুটা পেয়েছে অরুণ।

মাধবীকে আমরা সহপাঠিনী পেয়েছি প্রেসিডেন্সী থেকে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রী। লেখাপড়ায় ভালো। চুপচাপ মেয়েটি।

দেখতে সুশ্রী। তার চেয়ে বড় হলো তার কমনীয়তা। ভারী নরম স্নিগ্ধ একটা ভাব আছে মাধবীর মধ্যে।

এখন, বিজয়ের কথা বলতে বসে সেই সময়কার কত কথা যে মনে পড়ছে। অরুণকে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মাধবীকে। আর সকলকে ছাড়িয়ে সকলকে ছাপিয়ে বিজয়ের কথা মনে পড়ছে।

সেই সকলেই ত' আছে। যে যার জীবনে, সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায়। একা বিজয়ই বাঁচতে পারল না। সে-ই চলে গেল।

কেন এমন করে চলে যেতে হলো তাকে? ভাবছি, আর দুঃখ হচ্ছে। বিজয়ের সেই মুখখানা মনে পড়ছে। আমার ঘরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সে বলছে গম্ভীর সুন্দর কণ্ঠে

To remember with love,
To remember with tears.

বিজয় কি আজ জানতে পারছে, তার সে প্রথম যৌবনের দিনগুলির স্মৃতি আমার মনে ফিরে ফিরে আসছে—ভালোবাসা আর অশ্রুজলে ভিজে ভিজে?

অরুণ আর মাধবীর কথাই বলি।

ডায়মণ্ডহারবার রোডের ধারে ঠাকুরপুকুরে দিলীপদের বাগানে আমাদের এক পিকনিকের কথা মনে পড়ছে। আমরা ছিলাম হৈ-চৈ করতে ব্যস্ত। বিজয় সেখানে ঘাসের ওপর বসে আবৃত্তি করছিলো ওমরখৈয়াম। শুনছিলো অনেকে।

মনে পড়ছে মাধবী বেশী কথা না বলে চুপচাপ রান্নার কাজে কেমন লেগে গেল কোমর বেঁধে। কাঁচা কাঠের আগুন নিভে নিভে যাচ্ছে—ওদিকে মাধবী খিচুড়ী দেখতে ব্যস্ত। অরুণ তাকে বিব্রত হতে দেখে উঠে গিয়ে সাহায্য করলো। তারপর দুইজনে মিলে শেষ করলো রান্নাবান্নার অপ্রীতিকর অধ্যায়টা। সেদিনই বিকেলের দিকে, অরুণ গান ধরেছিলো। মাধবী অনেক কথা কয়ে প্রশংসা করেনি। শুধু তার চোখ অভিনন্দিত করেছিলো অরুণকে। আর, তার

থেকেই কি প্রেরণা পেয়েছিলো অরুণ? চোখ বুঁজে, গাছে হেলান দিয়ে, অরুণ একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছিলো। কোন্ প্রেরণা ছিলো তার পেছনে—সেদিন বুঝতে পারিনি আমরা।

কেন যে বুঝতে পারিনি, তা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে! অরুণের মতো ছেলে, তার ভালবাসার প্রকাশগুলোও যে অমনই হবে তা ত' আমাদের বোঝা উচিত ছিল। মাধবীই বা কেন বোঝেনি? তার পক্ষে ত' বোঝা অনেক সহজ ছিলো।

আসলে আমরা শুধু বিজয়কেই দেখতাম। বিজয়কে ছাড়িয়ে আর কারুকে আমাদের নজরে পড়তো না। আমাদেরও না, মাধবীরও না। বিজয় আমাদের এমন করে তার মধ্যে আকৃষ্ট করে রাখত, যে আর কারো দিকে চাওয়া, আর কারো মন বোঝা সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে।

এ কথা অবশ্য সবাই জানতো যে, বিজয়ের দীপ্তিতে অন্য বহুজনের মত মাধবীও বিমুগ্ধ। কিন্তু সেটাকে আমরা অতি স্বাভাবিক বলে মনে করেছি। বিজয়ের সঙ্গে সকলের তুলনা চলে না। বিজয়ের সান্নিধ্যে থেকে তাকে দেখে বিভ্রান্ত না হওয়াই আশ্চর্য।

আমাদেরই মতো মাধবী বিজয়ের সমস্ত উন্নাসিকতাকে মনে করতো প্রতিভার স্বাভাবিক রূপ। বিজয় যে একটা আশ্চর্য ছেলে, বিজয়কে যে ঠিক বুঝতে পারছে না কেউ, বিজয়ের পরীক্ষার ফলাফল দেখে যে তাকে বিচার করা ঠিক নয়—এ সব কথা আমাদের কাছে, অরুণের কাছেও বারবার শুনেছে মাধবী। বিজয়ের রুক্ষ চুল, দীপ্ত ললাট, গম্ভীর কণ্ঠ—সব মিলিয়ে তার মনে একটা কুহকের সৃষ্টি হলো। বিজয়ের ব্যক্তিত্বটা রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত সেই যক্ষপুরীর স্বর্ণ-জালের মত মাধবীর চোখের সামনে নিত্য নতুন জাদু বিস্তার করতে লাগল। সেই যবনিকার আড়াল থেকে বিজয় হয়ে উঠল মোহময়। একজন অবহেলিত, অবজ্ঞাত শেলী বা শোপেনহাওয়ার বা গ্যেটের

সঙ্গে মেশবার সৌভাগ্য হচ্ছে তার—এই মনে করেই মাধবী ধন্য হয়ে রইলো।

অরুণের সঙ্গে মাধবীর সম্পর্ক হলো সহজ বন্ধুত্বের। 'আপনি'র জানাজানির আড়ালে যদি 'তুমি'র কানাকানি চলতো—তাহলে সুখী হতো অরুণ। কিন্তু মাধবী সহজ প্রীতিভরেই তাকে তুমি বলে ডাকলো। অরুণ বোধহয় ভেবেছিল, মাধবীর মত মেয়ের প্রেমের অভিব্যক্তি ঐরকম সহজ স্বাভাবিকই হবে। তাই প্রীতিকে সে মনে করেছিল প্রেম।

প্রেম বুঝি মানুষকে অন্ধ করে। চোখ খুলে দেয় না।

কিন্তু সূর্যমুখী যেমন সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে—মাধবী যে তেমনি বিজয়ের দিকে চেয়ে থাকতে শিখেছে, তা দেখেনি অরুণ। তার ভুল হয়েছিলো।

প্রেম মাধবীর মত সহজ মেয়েকেও করে তোলে দুর্বোধ্য। প্রেমের পন্থা বড় জটিল। অরুণকে দেখে সে সহজ প্রীতিভরে এগিয়ে এসে কথা বলে। বিজয়ের দিকে সে সকলের মাঝে চায় না অবধি। কখনো যদি অজানিতে দু'জনের চোখে চোখে মিলে যায়—মাধবী লাল হয়ে ওঠে। ফিরিয়ে নেয় চোখ। বিজয়ের সঙ্গে যদি সে সকলের মাঝেও কথা বলে—এমন নরম করে, এমন স্নিগ্ধ সুরে বলে যে, মনে হয় এখানে আর কেউ নেই, কিছু নেই—ভক্ত এসেছে দেবতার কাছে বিনম্র মন্ত্রোচ্চারে স্তব করতে।

আশাবরী ও ললিতের সব গতিবিধি বুঝতো অরুণ। কিন্তু মাধবীকে সে বুঝতে পারেনি।

বিজয়কে ভক্তি করা যায়, তাকে দেখে মুগ্ধ হওয়া যায়—কিন্তু তাকেও যে ভালবাসা যায়—আর মাধবী যে তাকে ভালবাসতে পারে সে সম্ভাবনা অরুণের মনে কোথাও ছিল না। তাই, মাধবীর ভাবান্তর সে দেখেও দেখেনি।

মাধবী তার সঙ্গে সহজে মিশতো। সোস্যালে অরুণের সঙ্গে

একসঙ্গে সেক্রেটারী হয়ে সে নাটক, জলসা, বিতর্ক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করতো। কারণে অকারণে অরুণকে বলতো—

—চল, একটু চা খাই অরুণ, একলা ভাল লাগছে না।

আজ মনে হয়, কেন অরুণ লক্ষ্য করেনি—তখনও, একসঙ্গে বসে চা খেতে খেতে মাধবী বিজয়ের প্রসঙ্গেই ঘুরে ফিরে আসতে চাইছে। বিজয়ের কথাই শুনতে চাইছে।

আজ আর সে বিগত দিনের দুঃখবেদনার কথা কে মনে রেখেছে!

তবু এ কথাও মনে হয়, বিজয়কে ঘিরে, বিজয়কে কেন্দ্র করে যেদিন এইসব ঘটনাগুলি ঘটেছিল, বিজয় কি জানত সে কথা?

ভাবি, আর মনে হয়, কেন বিজয় অমন আত্মকেন্দ্রিক ছিল? যদি সে বুঝতে পারতো, বুঝতে চাইতো মাধবীকে······যদি! এসব কথা ভাবার কোন মানেই হয় না। তবু যেন মনে হয় সকলেই ত' রয়ে গেলাম আমরা। তাকেই কেন সরে যেতে হলো, চলে যেতে হলো?

অরুণের কথা আবার মনে পড়ছে। সেদিন তাকে সবিতা রায় হঠাৎ মুখের ওপর বলে বসলো—অরুণ, তুমি ভুল করছ।

অরুণ যেন সচকিত হলো।

সেদিন ক্লাস ভাঙলে পরে অরুণ বলল—বাদল চল,—একটু কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসি।

কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসলাম। অরুণ বুঝি চট করে নিজের কথায় আসতে পারছিল না। সে তুললো তার ভাই তপনের কথা। বলল—তপনটা বড্ড ভাবিয়ে তুলছে।

তপন ভাবিয়ে তুলছে? মানে বুঝলাম না। তপন ত' ভাবায় না। নিজেই ভাবে। বরঞ্চ দেখলে মনে হয়, বিশ্ব-সংসারের সকল ভাবনার ভার তার ওপরে। কার ছেলের টি. বি. হয়েছে, ভর্তি করতে পারছে না যাদবপুরে—অমনি তপন ছুটলো। একে তাকে ধরাধরি

করে হোক, যা করে হোক—ভর্তি করবার ব্যবস্থা করল তাকে। আমাদের পুরোনো ইস্কুলের ইংরেজি সার তাঁর বড় ছেলে মারা যেতে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তপনের সঙ্গে তাঁর বাজারে দেখা হয়েছিল। তপন লাইব্রেরির পক্ষ থেকে ভাল ভাল আর্টিস্ট দু'চারজনকে এনে, টিকিট বেচে জলসা করে টাকা তুলে দিলো মাস্টারমশাইকে। এ সব কাজ করছে বলে যে সে ধন্যবাদের প্রত্যাশী—মোটেও তা নয়। অরুণ গান করে। অরুণের অসুবিধা হবে বলে বাড়ির সকল কাজই তপন নিজে করে। বাজার-দোকান, ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া, মাকে নিয়ে এখানে-সেখানে যাওয়া, বোনের বিয়ের খোঁজ-খবর করা। তপনও যে অন্য লোকের ভাবনার কারণ হতে পারে, এ আমি ভাবতে পারি না।

অরুণ আস্তে আস্তে বলে—স্বাতী জোয়ারদারের কথা জান ত'? তপনকে অনেকে অনেক কথা বলছে। বাড়িতে বাবাও রাগ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভাল করে। তপন বলে, স্বাতীর মধ্যে খারাপ কিছু নেই। একেবারে একলা আর নিঃসঙ্গ স্বাতী—তপন তাই তাকে সঙ্গ দিচ্ছে বন্ধুর মত।

হাজার হলেও সংস্কার যায় না মন থেকে। বলি—স্বাতী ত' বিবাহিত স্ত্রী একজনের?

—তপন বলে, ও বিয়ে কোন বিয়েই নয়। বিয়ের তিনমাস বাদ থেকে জোয়ারদার রয়েছে বর্মায়। একটি বর্মিজ মেয়েকে নিয়ে। কথাটা অবিশ্যি মিথ্যে নয়, আর কে না জানে, যে জোয়ারদার স্বাতীকে বিয়ে করেছিল টাকার জন্যে? স্বাতীকে স্কুলের চাকরিও তপনই জোগাড় করে দিয়েছে, জান ত'?

—ভাবছ কেন অরুণ? তপন ত' অন্যায় কিছু করে না সাধারণত।

—ভাবছি না আমি। আমার শ্রদ্ধাই হয়েছে বাদল। শুধু ভালবাসলেই হয় না। সাহসও দরকার হয়।

অরুণ আবার চুপ করে। আমি বলি—এবার নিজের কথা বল অরুণ। তপনের কথা বলতে ত' ডাকনি আমায়।

অরুণ বলে—বলছি। বলবার খুব কিছু নেই। শোন, এম-এ আমি আর পড়বনা ভাবছি।

—সে কি অরুণ ?

—না। আমার মাস্টারমশাইও বারণ করছেন। দুটো জিনিস আমার পোষাবে না। আর গান থেকেও নিশ্চয়ই আমি জীবনে দাঁড়াতে পারব। কতজনই ত' দাঁড়িয়েছে।

—তা হয়ত পারবে, কিন্তু অনেক সময় নেবে। আর তাই যদি করবে, ত' ছ'মাস আগেই ত' ছাড়তে পারতে ? সেই নতুন কলেজে যখন গানের স্টাফ নিল ? তোমার মাস্টারমশায় তো ছিলেন কমিটিতে ?

অরুণ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সামনের দিকে। তারপর বলে—

—কেমন করে ছাড়ি বলো ? ছেড়ে গেলে কি মাধবীকে দেখতে পেতাম ? জান, কবে থেকে মাধবীকে রোজ দেখতে পাব বলে শুধু সেই জন্যে ক্লাসে আসি। তপন ত' আমাকে কবে থেকে বলছে এম-এ ছেড়ে দিতে। বুঝি, যে মিছামিছি পড়বার কোন মানে হয় না। তবু ছাড়তে পারি না।

আমার দিকে ফিরে চায় অরুণ। বলে—মাধবীকে আমি ভালবাসি বাদল। মনে হয় সে-ও আমায় অপছন্দ করে না। বলব তাকে ?

কি বলব ভেবে পাই না। অরুণ বলে—ঠিক যে তোমার কাছ থেকে জানতে চাইছি কি করব না-করব, তা নয়। এইটুকু বলতে বড় ইচ্ছে করলো। মাধবীকে বলতে পারি না—কারুকে জানাতে পারি না—তিনটে বছর ধরে কথাটা শুধু নিজেকেই বলি বারবার।

আমি বলি—বলতে বাধা কোথায় অরুণ ?

—বাধা নিজেরই মধ্যে। জান বাদল, এখন এমন হয়েছে—

মাধবীকে ছাড়া আর যেন কিছু ভাবতে পারি না। এ রকম হয়?

কেমন করে জানব? আমার ত' কোনদিনও এরকম হয়নি। অরুণকে কিছু বলতে পারি না। এ-কথা নিয়ে ঠাট্টাও করতে পারি না। অরুণ চিরদিন অপরের কথাই শোনে, নিজের কথা কারুকে বলে না। সে যখন নেহাৎ নিজের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি—তখনই সে আমাকে জানিয়েছে। আমি বলি—অরুণ, আর কেউ জানে?

—জানি না। আমি ত' কারুকে বলিনি।

আমাকে অরুণ চিরদিনই তার মনের কথা বলেছে। সেই জন্যই মাধবীর সঙ্গে তার কি হয়েছিল না হয়েছিল সব আমি জেনেছিলাম। জেনে সেদিন কিছু করতে পারিনি। সহানুভূতি জানিয়ে অরুণকে ছোট করতে পারিনি।

হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা আমি সবিশেষ বুঝি না। বড় জটিল, বড় সূক্ষ্ম তার কলকব্জা। কোথায় ঘা লাগলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে তা জানবার সৌভাগ্য কোনদিনও আমার হলো না।

অরুণ যখন এসে বললো আমাকে—আমি চুপ করেই শুনলাম। শুধু এ কথায় মনে হলো, বলি—অরুণ তুমি কি নির্বোধ? তুমি কি কিছুই বোঝনি?

মনেই হয়েছিলো। অরুণকে সে কথা বলিনি।

ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটকে নিয়ে বিজয়ের সে লেখা স্টেট্‌স্‌ম্যান নয় অন্য কাগজ ছেপেছিল। সেদিন মাধবী ক্লাসে এলো ঝলমলে মুখে। দিলীপ বলল—আজকে বিজয়ের সম্মানে একটু কফি খাওয়া যাক।

বিজয়ের সে পঞ্চাশটা বই ঘেঁটে রেফারেন্স দেওয়া, ফুটনোটে কণ্টকিত লেখাটা নিয়ে বিজয়ের থেকেও যেন আমাদের গর্ব বেশী। বিজয় সেদিন বক্তৃতা দিতে শুরু করল আর্কিটেক্চার নিয়ে। মাধবীর

দিকে আমি চুরি করে চাইছিলাম। মাধবীর মুগ্ধ দৃষ্টি বিজয়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরছিল। মনে হল, অরুণ যদি আজ কিছু বলে মাধবীকে—মাধবী বোধহয় সে কথা শুনতেও পাবে না কানে।

সেদিন বাড়ি ফেরবার পথে অরুণ বলল—চল মাধবী, একটু হাঁটা যাক।

দুজনেই দক্ষিণে থাকে। কলেজ স্ট্রীট ধরে দক্ষিণে হাঁটতে হাঁটতে তারা বসেছিল এসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। মাধবীর কি যেন হয়েছে আজ। সব কিছুই তার ভালো লাগছিল। একবার বলল—কি সুন্দর বেলফুলের মালা বিক্রী করছে দেখেছ?

অরুণ কিনল মালা। মালাটা হাতে জড়িয়ে নিয়ে মাধবী বলল—চিনেবাদাম খেলে বেশ হয়, তাই না?

তারই মধ্যে অরুণ বলল—মাধবী, একটা কথা বলব তোমায়? জানি না তুমি জান কি না! আমার মনে হয়, তুমি জান।

মাধবী আস্তে আস্তে যেন নিথর হয়ে গেল। চেয়ে রইল অরুণের দিকে। বলল—অরুণ, কথাটা কি না বললেই নয় আজ?

—কেন মাধবী, মানা করছ কেন? শোন, আমি তোমায় ভালবাসি মাধবী। আজ নয়, অনেকদিন ধরে। আমি ত' জানি তুমিও সে কথা জান মাধবী।

মাধবী যেন ক্রমেই বিব্রত হয়ে পড়ে। বলে—অরুণ, আমি আবার বলি, আজ না হয় এসব কথা থাক। আজ আমি তুমি একথা নাই বা আলোচনা করলাম অরুণ।

—বেশ ত' মাধবী!

—রাগ করো না অরুণ। আজ যদি তুমি কথা বল, আমাকে ত' জবাব দিতে হবে। আমি ত' তোমার সঙ্গে ছলনা করতে পারব না অরুণ। আমার মন যে প্রস্তুত নেই।

—শুনতে, না জবাব দিতে, মাধবী?

—দুটোই। আমাকে যদি আজ বল, আমি কোন উত্তর দিতে

পারব না। মনে প্রস্তুতি নেই বলে জবাবটা হয়তো আচমকা শোনাবে কানে। তাই বলি আজ থাক, অরুণ।

মাধবী যেন মিনতি করে। অরুণ আর জিজ্ঞাসা করে না। বলে —বেশ ত' মাধবী—থাক তবে।

—তুমি ব্যথা পেলে অরুণ ?

—না, মাধবী। এই তো হাসছি। তুমি চলে যাও মাধবী। আমি একটু একলা বসি এখানে, কেমন ?

চলে গিয়েছিল মাধবী। অরুণ সেদিন অনেকক্ষণ একলাই বসেছিল মাঠে। মাধবীর কথাগুলো, মাধবীর মুখখানা মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পার্কে বসে বসে বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরেছিল অরুণ পায়ে হেঁটে। মনে হয়েছিল, মাধবীর কথাগুলির মধ্যে কি কোন প্রত্যাখ্যান ছিল না ? মনে হয়েছিল, মাধবী অমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল কেন ? রেশটুকু ত' টেনে রাখতে পারতো সে। এমন সুরে কথা শেষ করতে পারতো, যাতে অরুণ আবার তার মনটা মেলে ধরবার আর একটা সুযোগ পায়। তা তো হল না। মাধবীর কথা যেন পূর্ণচ্ছেদই টানল।

অরুণ মনে মনে জানল, উপযাচক হয়ে কথা বলতে সে আর যাবে না।

পরদিন থেকে অরুণ মাধবীকে সযত্নে, শোভনভাবে এড়িয়ে চলতে লাগলো। মনের কথা তার মনেই রইলো। তবে ব্যবহারে বোঝা গেল, দু'জনের সহজ বন্ধুত্বের মাঝখানে একটা চিড় ধরেছে। অতি সূক্ষ্ম একটা বিচ্ছেদের রেখা নেমে এসেছে মাঝে। যেন সূচ্যগ্র হীরে দিয়ে কে কাঁচের ওপর চুলের মত সরু একটা রেখা টেনে কাঁচটাকে দুইভাগ করে দিয়েছে।

মাধবীর বুঝতে বাকি রইলো না, সে অরুণের মনে ব্যথা দিয়েছে। অপ্রতিভ হলো সে। বেদনা বোধ করলো। কিন্তু সে নিরুপায়। অরুণের জন্যে সে তখন কিছুই করতে পারে না। বহুদূরে মিনার-

চূড়ায় উজ্জ্বল প্রদীপ দেখে যদি কোন দুরাকাঙ্ক্ষ পথিক ছুটে চলে—, পথের পাশের আশ্রয়ের আহ্বান সে উপেক্ষা করেই চলবে। ঐ লক্ষ্যে সে পৌঁছবে কি না, সে কথা অবান্তর। ছুটে চলাটাই বড় কথা।

বিজয় তখন মাধবীকে তেমনি করেই টানছে। মাধবী যেন আর কিছু ভাবতে পারে না। বিজয়কে দেখলে তার চেহারা বদলে যায়। বিজয়ের কথা শুনতে শুনতে মনে হয় সে যেন সুরসপ্তকে বাঁধা কোন বীণ হয়ে গিয়েছে। আঙুল ছোঁয়ালেই বেজে উঠবে জয়জয়ন্তী।

তার ভেতর থেকে যেন একটা বাতি জ্বলে ওঠে। বিমুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে বিজয়ের দিকে। বিজয়ের একটা কথা, একটা ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

মাধবী ক্লাস টিউটোরিয়ালে ভাল করেছিল। শুনে বিজয় বলেছিল—বাঃ, বেশ ত' !

সেই থেকে মাধবী তার সমস্ত মনটা পড়াশুনায় লাগাতে চেষ্টা করল।

দেখে সবিতা বললো—বিজয়ের বন্ধু হওয়া বড় কঠিন, তাই না মাধবী ? মনে মনেও তার যোগ্য হতে হয়, শিক্ষায় দীক্ষায়—তাই নয় কি ?

এ কথার ভেতরে যে কোন শ্লেষ, কোন ইঙ্গিত আছে, তা মাধবীকে স্পর্শ করলো না। সে তার আশ্চর্য, বিমুগ্ধ দুটি চোখ তুলে সবিতার দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে বলল—

—হ্যাঁ সবিতা। তুমি বুঝতে পার সে কথা ?

সবিতা সেদিন অরুণের জন্য সত্যিই দুঃখ পেল। আমাকে বলল—

—তোমাদের বন্ধু ঐ অরুণ মজুমদার সত্যিই হতভাগ্য। আর, আরো হতভাগ্য ঐ মাধবী।

আজ মনে হয়, সবিতা হয় ত' ঠিকই বুঝেছিল। সে ত'

বিজয় দাশের ভক্তগোষ্ঠিতে ছিল না—সে ঠিকই বিজয়কে চিনেছিল। ভুল করে নি।

আমরা কি সবাই চোখে এক অদৃশ্য চশমা পরেছিলাম? তার কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখেছিলাম বিজয়কে?

বিজয়ের কথা মনে করতে গিয়ে এসব কথা আমার মনে হয়। আজও মনে হয়।

এই সময় মাধবীকে দেখে অরুণ প্রেম ও প্রীতির পার্থক্য ভাল করেই বুঝলো। সেও দেখতো মাধবীকে। সকলের অলক্ষ্যে।

পরে, অনেক পরে সে বলেছে—মাধবী আমাকে ভালো নাই বাসলো—প্রেমে পড়লে মাধবীকে যে অত সুন্দর দেখাবে—তাই আমি দেখতাম বাদল। আমার ধারণা ছিলো, আমি মাধবীর চোখে ঐ অতলান্ত কালো এনে দিতে পারব। ওকে অমনি করে সুরে বেঁধে বাজাতে পারব—আমি পারিনি। নাই পারলাম। তবু মাধবী মাধবীই। অন্য কারো সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

এসব আমি বুঝি না। প্রেমের ব্যাপারে আমি বড় অনভিজ্ঞ। আর অরুণের চোখে মাধবী যত সুন্দর—আমার চোখে তত হবে কেমন করে? এ তো হল সেই লায়লী-মজনুর ব্যাপার। অরুণই পড়ে শুনিয়েছিল একদিন, যে লায়লীকে দেখে এক বিদেশী কবি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—তুমিই লায়লী? কই, তুমি ত' অসামান্য রূপসী নও? তোমাকে না পেয়ে সে যুবক মজনু হয়ে গেল কি করে? কেমন করে তাকে দিওয়ানা বানালে তুমি?

সে কথা শুনে লায়লী সগর্বে বলেছিল—'লায়লীকো মজনুকে আঁখসে দেখ্‌না।'

অর্থাৎ লায়লীকে দেখো মজনুর চোখ দিয়ে। প্রেমিক চোখ না থাকলে কেমন করে তুমি অন্য এক মর্ত্যের মানুষের মধ্যে স্বর্গের সুষমা খুঁজে পাবে?

অরুণ কিন্তু বিজয়কে কোনদিন একটা কথাও বলল না।

তবু জানাজানি হল। অরুণের জন্য নয়—মাধবীর জন্যই। বিজয়ের প্রতি প্রেমে কোন অবগুণ্ঠন রাখেনি মাধবী। বলা চলে—বিজয় দাশকে যে সে ভালোবাসে, এই সত্যটাকে সে মহামূল্য কোন হীরের গহনার মত ধারণ করল। সকলকে দেখতে দিল, জানতে দিল। আশ্চর্য ক্ষমতা বিজয়ের। নইলে মাধবীর পক্ষে অতখানি আত্মপ্রকাশ প্রায় নির্লজ্জতারই নামান্তর। সবিতা রায়ের কথায়-বার্তায় এখন মাধবীর প্রতি সামান্য শ্লেষও থাকতো।

এই ত্রিভুজ সম্পর্কে মুখর হল ইউনিভার্সিটি। অরুণ মাধবীকে ভালোবাসে, মাধবী চায় বিজয়ের প্রেম—আর বিজয়? বিজয় বুঝি নিজেকে ছাড়া আর কারুকে ভালবাসে না। বিজয়কে যারা দেখতে পারত না, আর বিজয়ের স্তাবক বলে আমাদের যারা ব্যঙ্গ করত, তারা ক'জন মিলে 'নার্সিসাস্ ও মাধবিকা' নামে একখানা চটি বই ছাপিয়ে ফেলল। হাতে হাতে ফিরল সে বই: মাধবীকে দেখে চেঁচিয়ে উঠত কোন উৎসাহী ছেলে—'হে মাধবী, ভীরু মাধবী, তোমার দ্বিধা কেন?'

মাধবী রঙীন শাড়ি পরে, সুন্দর সেজে, নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত। এত কথা, এত হাসি, কিছুই যেন তাকে ছুঁতো না।

আর বিজয়? আজ মনে হয়, মাধবীর সে প্রেম, চোখের চাহনিতে মুখের হাসিতে সে নিরন্তর আত্মনিবেদন বিজয়কে বুঝি স্পর্শও করেনি। বিজয় বুঝতে পারেনি।

চার

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে বছর যারা ইংরেজীতে পাস করেছিল, তাদের মধ্যে বিজয় দাশ-এর নাম ছিল শেষের দিকে। কিন্তু তখন তার সাধনা সিদ্ধির পথে। তাকে ঘিরে ততদিনে গড়ে উঠেছে একটি উন্নাসিক ভক্তমণ্ডলী। তাদেরই একজনের বালিগঞ্জের বাড়িতে কাঁচঘরে হলো তাদের 'সিলেক্ট' ক্লাবের অধিবেশন। দিলীপ এসে বলল—সোজা কথা নয়, ও হল রেইনীপার্কের সেই বিখ্যাত বাড়ি। কালচার দিয়ে ও-বাড়ির ইঁটগুলো ভেজানো।

—মদ দিয়ে বল ?

প্রণবকে চাপড় মেরে থামিয়ে দিল দিলীপ। বলল—মদের ডিলার ওরা। 'সেন'কে লেখে 'Seyne', বাংলায় বলে 'শ্যেইন্'। তা বলে মদ দিয়ে ইঁট ভেজাবে কেন? আসলে তোরা বোগাস। বাংলা বুঝিস না, তার ইংরিজীর কি বুঝবি! ওরা একসময়ে জার্মানী থেকে বেহালা-বাজিয়ে আসবেন বলে মিনিয়েচার স্টেজ বানিয়ে ফেলেছিল। দারুণ কালচারের বাতিক। ওরা পেয়ালায় চা-কফি খায় না। বোর্নিও থেকে বাঁশের বাটি এনেছে। ওদের বাড়িতে দেশী গাছের মধ্যে কাশ্মীরের চেনার। বাকি সব বিদেশের গাছ। জাপান থেকে বিশেষজ্ঞ এনে বাগান নক্সা করিয়েছিল। যে তিনমাস জাপানী ভদ্রলোক ছিলেন, শুনেছি সে কয়দিন মিসেস্ সেন কিমোনো পরতেন, জাপানী ঢঙে চুল বাঁধতেন, হাঁটু মুড়ে বসে চা-এর বাটি প্রণামের ভঙ্গীতে তুলে ধরতেন। তা বিজয় এবার মেরে দিল কেল্লা।

—তুই-ই ঢুকিয়েছিস তো? শুনছি ও বাড়ির রঞ্জনার সঙ্গে তোর খুব ভাব।

দিলীপও লজ্জা পায় দেখে আমরা হেসে উঠি। দিলীপ বলে—

—ওদের বাড়িতে ঐ মেয়েটা হল সৃষ্টিছাড়া। ওকে ওরা কিছুতেই মানুষ করতে পারছে না। ওদের ঐ সব পার্টিতে ও বেরুবে না। তাই নিয়ে ওর মা বাবা দিদিদের মনে কি দুঃখ। বাবাকে ত' জানতেন মিসেস সেন—বললেন, দেখ দিলীপ, যদি রঞ্জনাকে মানুষ করতে পার। এইজন্যে, নইলে আমার মতো অভাজনের সঙ্গে ওর ভাব হয় কখনো? আমি অবশ্য বলে রেখেছি বিয়ে করতে হবে আমাকে। নইলে ভাব করতে পারবো না।

—কি বললি? আলাপ না হতেই বিয়ের কথা? তুই একটা হতভাগা।

দিলীপ বলে—কি করবো ভাই। আমি কষ্ট করে ভাব করব, আর বিয়ে করবে আর একটা লোক, সে আমার মোটেই সইবে না। দেখলাম তো অরুণকে। আমি ভাই ওসব দুঃখ সইতে পারব না। ফাটাফাটি হয়ে যাবে।

—রঞ্জনা সেন কি বলল?

—বলব না। বলে দিলীপ এমনভাবে হাসে যে, স্পষ্ট বোঝা যায়, আর একবার সাধলেই সে বলবে। তারপর বলে—বিজয়কে ওরা যদি একটু ব্যাক করে তো দেখবি—দু'বছর বাদে বিজয়ের ল্যাজে হাত দেওয়া যাবে না।

রেইনীপার্ক-এ 'সিলেক্ট'-এ যেতে শুরু করল বিজয়, আর আমাদের গোষ্ঠি থেকে যেন সে টুপ করে খসে পড়ল। বিজয়কে আমরা আর ডেকে ডেকে পাই না। যখনই খোঁজ করি, সুজয় বা কুমুদ বলে—বাড়ি নেই দাদা।

বিজয়ের নতুন পরিচয়ের দল, বিজয়কে যেমন অনভ্যস্ত মাথায় স্কচ্-এর নেশা ধরিয়ে দিলো, তারাও বোধহয় বিজয়ের মধ্যে মুখ বদলে খাঁটি দেশীর আস্বাদ পেল। দুই পক্ষই দুইপক্ষকে নেশা ধরাল। জমলো ভাল।

চার

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে বছর যারা ইংরেজীতে পাস করেছিল, তাদের মধ্যে বিজয় দাশ-এর নাম ছিল শেষের দিকে। কিন্তু তখন তার সাধনা সিদ্ধির পথে। তাকে ঘিরে ততদিনে গড়ে উঠেছে একটি উন্নাসিক ভক্তমণ্ডলী। তাদেরই একজনের বালিগঞ্জের বাড়িতে কাঁচঘরে হলো তাদের 'সিলেক্ট' ক্লাবের অধিবেশন। দিলীপ এসে বলল—সোজা কথা নয়, ও হল রেইনীপার্কের সেই বিখ্যাত বাড়ি। কালচার দিয়ে ও-বাড়ির ইঁটগুলো ভেজানো।

—মদ দিয়ে বল?

প্রণবকে চাপড় মেরে থামিয়ে দিল দিলীপ। বলল—মদের ডিলার ওরা। 'সেন'কে লেখে 'Seyne', বাংলায় বলে 'শ্যেইন্'। তা বলে মদ দিয়ে ইঁট ভেজাবে কেন? আসলে তোরা বোগাস। বাংলা বুঝিস না, তার ইংরিজীর কি বুঝবি! ওরা একসময়ে জার্মানী থেকে বেহালা-বাজিয়ে আসবেন বলে মিনিয়েচার স্টেজ বানিয়ে ফেলেছিল। দারুণ কালচারের বাতিক। ওরা পেয়ালায় চা-কফি খায় না। বোর্নিও থেকে বাঁশের বাটি এনেছে। ওদের বাড়িতে দেশী গাছের মধ্যে কাশ্মীরের চেনার। বাকি সব বিদেশের গাছ। জাপান থেকে বিশেষজ্ঞ এনে বাগান নক্সা করিয়েছিল। যে তিনমাস জাপানী ভদ্রলোক ছিলেন, শুনেছি সে কয়দিন মিসেস্ সেন কিমোনো পরতেন, জাপানী ঢঙে চুল বাঁধতেন, হাঁটু মুড়ে বসে চা-এর বাটি প্রণামের ভঙ্গীতে তুলে ধরতেন। তা বিজয় এবার মেরে দিল কেল্লা।

—তুই-ই ঢুকিয়েছিস তো? শুনছি ও বাড়ির রঞ্জনার সঙ্গে তোর খুব ভাব।

দিলীপও লজ্জা পায় দেখে আমরা হেসে উঠি। দিলীপ বলে—

—ওদের বাড়িতে ঐ মেয়েটা হল সৃষ্টিছাড়া। ওকে ওরা কিছুতেই মানুষ করতে পারছে না। ওদের ঐ সব পার্টিতে ও বেরুবে না। তাই নিয়ে ওর মা বাবা দিদিদের মনে কি দুঃখ। বাবাকে ত' জানতেন মিসেস সেন—বললেন, দেখ দিলীপ, যদি রঞ্জনাকে মানুষ করতে পার। এইজন্যে, নইলে আমার মতো অভাজনের সঙ্গে ওর ভাব হয় কখনো? আমি অবশ্য বলে রেখেছি বিয়ে করতে হবে আমাকে। নইলে ভাব করতে পারবো না।

—কি বললি? আলাপ না হতেই বিয়ের কথা? তুই একটা হতভাগা।

দিলীপ বলে—কি করবো ভাই। আমি কষ্ট করে ভাব করব, আর বিয়ে করবে আর একটা লোক, সে আমার মোটেই সইবে না। দেখলাম তো অরুণকে। আমি ভাই ওসব দুঃখ সইতে পারব না। ফাঁটাফাটি হয়ে যাবে।

—রঞ্জনা সেন কি বলল?

—বলব না। বলে দিলীপ এমনভাবে হাসে যে, স্পষ্ট বোঝা যায়, আর একবার সাধলেই সে বলবে। তারপর বলে—বিজয়কে ওরা যদি একটু ব্যাক করে তো দেখবি—দু'বছর বাদে বিজয়ের ল্যাজে হাত দেওয়া যাবে না।

রেইনীপার্ক-এ 'সিলেক্ট'-এ যেতে শুরু করল বিজয়, আর আমাদের গোষ্ঠি থেকে যেন সে টুপ করে খসে পড়ল। বিজয়কে আমরা আর ডেকে ডেকে পাই না। যখনই খোঁজ করি, সুজয় বা কুমুদ বলে—বাড়ি নেই দাদা।

বিজয়ের নতুন পরিচয়ের দল, বিজয়কে যেমন অনভ্যস্ত মাথায় স্কচ্-এর নেশা ধরিয়ে দিলো, তারাও বোধহয় বিজয়ের মধ্যে মুখ বদলে খাঁটি দেশীর আস্বাদ পেল। দুই পক্ষই দুইপক্ষকে নেশা ধরাল। জমলো ভাল।

রেইনীপার্কের সে বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা যারা আসে, তারা বাংলাদেশের হাতে বাছাই করা কিছু নরনারী। মহিলাদের সংখ্যাই বেশী। সেই সৃষ্টিছাড়া উন্নাসিকমণ্ডলীর পুরুষমেয়েরা বিজয় দাশের নাম ক্বচিৎ শুনে থাকে। সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। মধ্যবিত্ত সেখানে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় না।

মাধবীর গোষ্ঠি থেকেও বিজয় হঠাৎ হারিয়ে গেল। মাধবী যেন ঠিক বুঝতে পারল না। এম. এ. পাস করে সে ঢুকেছে একটা মেয়ে কলেজে লেকচারার হয়ে। আমি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছি— আর বাকি সময়টা কাকার অফিসে কেরানীগিরি করে হাত পাকাচ্ছি। দীপঙ্কর গিয়েছে বিলেতে। অনাদি আর্ট কলেজ থেকে বেরুচ্ছে। কোন পাবলিসিটি ফার্মে কাজ ওর বাঁধা। অরুণ মনপ্রাণ দিয়ে গান শিখছে। মাঝখান থেকে এম. এ. পড়াটা ওর বৃথা গেল বলে মনে হচ্ছে।

মাধবী ঘুরে-ফিরে আমার কাছেই আসে। বলে—বিজয়ের খবর কি জান বাদল ?

আমরা ততদিনে এটুকু জেনেছি যে, মাধবীর কথা বিজয় দিনান্তে একবারও মনে করে না। কিন্তু সে কথা কেমন করে তাকে বলি ? মাধবী অরুণের আশাভঙ্গের কারণ। তাই বলে মাধবীর মনটা ভেঙে দিই কি করে ? আমি বলি মনগড়া কথা। যা শুনলে মাধবীর ভালো লাগবে। বলি—বিজয় এখন নানারকম কাজে ব্যস্ত। জানো নিশ্চয়ই, বিজয় ইংরেজী রোমান্টিক কবিতার কি নতুন একটা ব্যাখ্যা নিয়ে লিখছে ? একেবারে বই করেই বের করবে।

—কই, বাড়িতে ত' সে থাকে না বাদল।

—বাড়িতে বসে কি এসব কাজ হয় মাধবী ? লাইব্রেরিতে কাজ করতে হয়।

—কোন্ লাইব্রেরিতে যায়, জানো ?

প্রেম কেন অবুঝ করে মানুষকে? কেন আমাকে এতগুলো কথা বলায় মাধবী?

আমি বলি—ঐ সেনদের বিরাট লাইব্রেরি আছে, জান তো? বিজয় সেখানেই কাজ করছে আজকাল।

মাধবী তখন বলে—তাই ত' বিজয় বলেছিল বটে। আমিই ভুলে গিয়েছিলাম।

এমনও হয় যে অরুণ আমারই বাড়ি বসে আছে। মাধবী তার সামনেই কথা বলে আমার সঙ্গে। সে চলে গেলে অরুণ বলে—বাদল, মাধবীকে এই মিথ্যে কথাগুলো বলো না তুমি। আমার ভালো লাগে না।

—সত্যিটা কি বলা যায় অরুণ?

অরুণ চুপ করে চেয়ে থাকে। বলে—না। আশাভঙ্গটা ওর বোধহয় সইবে না। কিন্তু বাদল, একদিন তো ও জানবেই।

—আমি কি করতে পারি বল অরুণ?

এই রকমই চলে। মাধবী বিজয়কে খুঁজে চলে যায়। অরুণের দিকে চেয়ে বড়জোর একটু ভদ্রতার হাসি হাসে। মাধবীর কথা ভাবতে চায় না। তবু অরুণ মাধবীর কথাই ভাবে। মাধবী নিরাশ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চলে যায়। দেখে দেখে অরুণ শুধু ভাবে—মাধবীর মুখের ঐ হতাশা সে মুছে দিতে পারে না? মানুষ এত অক্ষম কেন হয়?

মাধবী যদি জানতো, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কারা—কারা বিজয়ের দিনরাত ভরে রেখেছে, সে নিশ্চয় নির্বোধ আশার মোহে ঘুরে ঘুরে মরতো না।

বিজয়ের বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, অতি সহজে সমস্ত প্রচলিত মতবাদকে উপেক্ষা করবার সাহস, মানুষকে দেখেও না দেখবার ভান করা—এই সব দেখে ঝুঁকলেন বিবলি বোস, বুলা রায়, পিকপিক

সোম প্রমুখ বিবাহিতা-অবিবাহিতা মহিলারা। তাঁদের ভূগোলে এ কথা বলে না যে পৃথিবী গোলাকার। তাঁরা জানেন পৃথিবী হচ্ছে একখানা রূপোর চামচের ছাঁদে তৈরি। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তাঁদের জীবনটা নিরাপত্তার আশ্বাসে অটল। অজস্র টাকা না থাকলে কেমন লাগে, তা তাঁরা কোনদিনও জানবেন না।

তবু তাঁরা টাকা ছাড়া আর কিছু ভালবাসেন না, ভালবাসতে পারেন না। ভালবাসা—এই কথাটা নিয়ে অনেক ভাবে অনেক সময়ে তাঁরা ব্যবহার করেন। মানুষকে ভালবাসি, থিয়েটার ভালবাসি, কুকুর ভালবাসি, মিউজিক ভালবাসি, কটকী শাড়ী ভালবাসি, ঠাণ্ডা বিয়ার ভালবাসি, সবুজ ঘাস ভালবাসি—এইসব কথা তাঁরা সব সময় বলেন। তবে এসব হলো ওপরের স্রোত। নদীর তলায় যেমন আসল, নিয়ন্তা স্রোতটা বালির বুক ধরে নিরন্তর বয়ে চলেছে—এঁদের মনের তলায়ও তেমনি একটাই ভালবাসা সর্বদা সবকিছু ছুঁয়ে আছে। সব নিয়ন্ত্রণ করছে। সে হলো অসাধারণ অর্থপ্রীতি। এঁরা কতখানি টাকা ভালোবাসেন, সে জানে এঁদের স্বামীদের অধীনে যারা কাজ করে, সেইসব হতভাগ্যরা, আর গৃহিণীদের অর্থপ্রীতির কামড় বোঝে বেয়ারা, দর্জি আর মুদী বা বাবুর্চি। সেখানে চার আনা বা আট আনার জন্য সকালবেলা বকাবকি করে চলতে পারেন এঁরা এক ঘণ্টা ধরে। দশবিশ বছরের পুরনো চাকরকে একখানা মাছ, একটু মাখন বা একটা টাকা চুরি করেছে বলে বকাবকি করতে এঁদের এতটুকু বাধে না। এঁদের বড় বাড়ি বা বড় গাড়ি দেখে সাহায্যের আশায় কোন হতভাগ্য প্রার্থী যদি ঢুকে পড়েন—তাঁকে দাঁড় করিয়ে দুই ঘণ্টা ধরে এঁরা ভিক্ষাবৃত্তি যে কত হীন, সে বিষয়ে লেকচার দিয়ে খালি হাতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু তারপর, যেই সন্ধ্যা গড়াতে থাকে, এঁদের মনে অন্য অন্য ভালবাসা জেগে ওঠে—সংস্কৃতির ক্ষিদে, সাহিত্যের পিপাসা—ভাল ভাল সব চিত্তবৃত্তি।

তখন এই 'সিলেক্ট'-ই ভরসা।

তাঁদের সমাজে ভালো নামে ডাকবার রেওয়াজ নেই। তাই, বাংলার শিল্পপতিদের অন্যতম মান্যবর গাঙ্গুলী সাহেব এখানে ঢুকলেই হয়ে যান বুব্‌লু। তাঁকে দেখে প্রখ্যাত ডাক্তারের বৌ সুচন্দ্রা সোম স্বচ্ছন্দে রুমালের টোকা মেরে বলেন—বুব্‌লু, এত দুষ্টু হয়েছ তুমি? ডক্টর ভাগ্‌নারের রিসেপশান-এ এলে না?

ভর্ৎসনা করতে গিয়ে তাঁর আঁকা ভুরু থরথর করে কাঁপে। বুব্‌লু বলেন—পিক্‌পিক, সে রিসেপসান-এ যাব কেন? বলছি যে, ডাক্তারকে বাইরে পাঠিয়ে আমার সঙ্গে চলো, ডি. ভি. সি. ঘুরে আসবে। শুধু তুমি আর আমি। চাঁদ উঠলে কোনার ড্যাম তো দেখনি!

পিকপিক বলেন—যাব। কিন্তু এখানে একজন ভীষণ ইন্টারেস্টিং মানুষ এসেছেন। বিজয় দাশ। কি রকম রিবেল চেহারা। আমার মনে হচ্ছিল ইয়ং বিঠোফেনকে দেখছি।

—আচ্ছা? বলে হেসে সরে যান গাঙ্গুলী।

এখানে এসে বিজয়কে দেখে অজয় রায়ের স্ত্রী লতিকা রায়ের মনে হয়—গাড়ি, বাড়ি, সুদর্শনকান্তি স্বামী, চা-বাগানের মোটা শেয়ার আর সুন্দর দুটি সন্তান—এর মধ্যে কোন সুখ নেই। নিজেকে ভীষণ দুঃখী মনে হয় তাঁর। দেড়শো টাকার চন্দেরী শাড়ি মাটিতে লুটিয়ে তিনি ঘাসের ওপর বসে পড়েন বিজয়ের পাশে। বলেন—কি জানেন? জীবনে ঠিক মনের দোসর মিলল না। পেলাম না কাউকে।

—মনের দোসর পাওয়া যায় না মিসেস রায়। নিজের মনের রঙ মিশিয়ে তাকে গড়ে নিতে হয়।

—আপনি আমাকে বুলা বলবেন। মিসেস রায়, এ পরিচয় তো আট বছরের। কিন্তু তার আগের বিশটা বছর ধরে আমাকে সকলে বুলা বলেই জানে।

কিছুক্ষণ বাদেই বান্ধবী রুমা তালুকদারকে বলেন—কি রকম রুখা ভুখা ইন্টারেস্টিং চেহারা। আমি ওকে বলেছি আমাকে বুলা বলে ডাকতে।

বিবলি বোসের কাছে জীবনটা বড় ক্লান্তিকর। সব কিছুতেই ক্লান্ত লাগে তার। স্টীভেডোর বাড়ির মেয়ে। বাপ-দাদা সবাই স্টীভেডোর। নিরবচ্ছিন্ন সিগারেট খাওয়া ছাড়া অন্য কিছুতেই আকর্ষণ নেই তার। এ দেশে ক্লান্ত লাগে যখন, চলে যায় বিলেতে। বিবলি বোস রূপসী নয়। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? টাকা-পয়সার একটা স্তর আছে, যার পর আর রূপের দরকার করে না। রাতের পার্টি, রাতের ব্রিজ খেলা, রাতের জীবন যাপন করে করে বিবলির অবস্থা খানিকটা নিশাচর পেচকের মত। দিনের বেলা সে যেন জাগতে পারে না। চোখছুটো তার ঘুমিয়েই থাকে। বিজয়কে দেখে তার সে ঘুমঘুম চোখও সজাগ হল। সে কাছে এসে বলল—তুমি বিজয়? আমি কারুকে আপনি বলি না। রাগ করো না। তুমি লিখেছ ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটের ওপর? রাইটকে আমি দেখেছি আমেরিকায়। আলাপ হয়েছে আমার সঙ্গে। বিজয় আমাকে তোমার ভালো লাগছে?

এমনি আরো কতজন—সণ্টু মিত্তির, শিরীণ দত্ত, জিজি, মিসি, টুটু, সোনা, পিয়া, বুলবুল—সকলেই বিজয় দাশকে দেখে মুগ্ধ হল। ঐশ্বর্যের আফিমে জীবনে বাঁচবার সহজ আনন্দ, সহজ সুখ-ছুঃখ যাদের কাছে একেবারে অজ্ঞাত, তারাই উৎসাহিত হয়ে বলল—পেয়েছি একটা প্রতিভার সন্ধান।

আশ্চর্য কি যে অর্থকুলীন সমাজের এইসব বত্রিশ পুতুলের মুখে স্তুতিবাদ শুনে বিজয়ের ধারণা হলো যে, সত্যিই সে অসাধারণ!

‘সিলেক্ট’-এ নতুন প্রতিভা এলে প্রথমেই তাকে ছুই আঙুলে উড়িয়ে নিয়ে যায় সুচন্দ্রা সোম। অবশ্য এখানে সুচন্দ্রা পিকপিক নামেই পরিচিত। তাকে সুচন্দ্রা নামে ডাকেন মাত্র একজন—

তিনি সঞ্জয় সোম—পিকপিকের দেওর। ডাক্তার অঞ্জন সোম আর বড় চাকুরে সঞ্জয় সোম, তুজনের সঙ্গেই টেবিল টেনিস খেলতেন আসামের চীফ কন্‌জারভেটর অফ ফরেস্ট-এর একমাত্র তুলালী পিকপিক মিত্র। পিকপিকের জন্ম নিয়ে তখনকার সরকারী খেতাবী মহলে নানারকম কথা চলতো। তুষ্টু লোকে বলতো জনৈকা পার্বতী আয়ার সঙ্গে নাকি পিকপিকের বাবার একটা প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পিকপিক সেই প্রেমের স্বাক্ষর। নইলে, এরকম তুরন্ত যৌবন, যা পিকপিকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা কখনো সভ্যসমাজে আর ভদ্ররক্তে সম্ভব হয় না।

পিকপিকের বেঁটে চুল, জ্বলজ্বলে চোখ, বাদামী রঙের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল টানটান চামড়া, উঁচু বুক, লাল ঠোঁট—সব কিছু মিলিয়ে সোম ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে তাকে ট্রপিকের কোনো নাম-না-জানা পাখীর মতোই বিচিত্র এবং আকর্ষণীয় বোধ হলো।

দেখা গেল হৃদয়ের খেলাতেও পিকপিক পাকা খেলোয়াড়। সে খেলতে জানে। বিয়ে করলো বটে অঞ্জন সোমকে, কিন্তু যেমনটি সকলে আশা করেছিল, তেমন কিছুই হলো না। সঞ্জয় সোম বন্দুক নিয়ে তাড়া করলেন না অঞ্জন সোমকে, অথবা তুই ভাইয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধও বাধলো না। বরঞ্চ সকলকে আশ্চর্য করে পিকপিকের ও অঞ্জন সোমের বিয়ের চিঠি সঞ্জয়ই বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে বেড়ালো।

বিয়ের একবছর বাদে থেকেই বোঝা গেল কি মেয়ে পিকপিক। কি অসাধারণ তার ক্ষমতা।

অঞ্জন সোম তার নার্সিং হোম আর পসার নিয়েই ব্যস্ত। পিকপিককে সঙ্গ দেবার ভার পড়লো সঞ্জয়ের ওপর। আশ্চর্য এই, যে এ সমাজে সব চলে জোড়াতালি দিয়ে। অঞ্জন সোমকে সেজন্য খুব ক্ষুণ্ণ খিত বোধ হলো না। নার্সিং হোম-এ সুন্দর সুন্দর সিসটার বাছাই-এ অঞ্জন সোমের দক্ষতা ছিলো।

সঞ্জয় সোমের সঙ্গে পিকপিকের সম্পর্কটা সকলেই জানে। সঞ্জয় পিকপিককে আজও সুচন্দ্রা বলেই ডাকেন। পিকপিক কিছুদিন বাদে বাদেই একটা নতুন প্রতিভা, একটা নতুন মানুষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সঞ্জয়ের তাতে দুঃখ নেই। তিনি জানেন, এ সবই হলো ওপরের ব্যাপার'। আসলে, হৃদয়ের গভীরে (যদি পিকপিকের হৃদয় বলে কিছু থাকে), পিকপিক তাঁর কাছে বাঁধা আছে।

বিজয় দাশের সম্পর্কে পিকপিক তাঁকে বললো—একেবারে নতুন! এমন একজন মানুষ আমি জীবনেও দেখিনি, জানলে সঞ্জয়?

সঞ্জয় বলেন—কত আর মুখ বদলাবে সুচন্দ্রা?

—যতদিন না তুমি আমার হও।

--এখনই কি নই?

—আরো কাছে, আরো নিবিড় করে, বুঝলে?

—বুঝলাম।

এত যদি প্রেম, তবে কেন পিকপিক অঞ্জন সোমকে ডিভোর্স করে না, কেন বিয়ে করে না সঞ্জয়কে, এসব কথা সঞ্জয় বা পিকপিক ভাবে না, ভাবতে চায় না।

বিজয় কি এত কথা জানে? সে কি ভাবতে পারে? পারে না। পিকপিক সোমের কূলকিনারা সে খুঁজে পাবে কেমন করে?

দিলীপ আমাদের কাছে সব খবর এনে দেয়। শুনি, আর বিজয়ের কথা জেনে আমরা বিভ্রান্ত হই। তারপর মনে হয়, আমরা তাকে আর কি দিতে পারতাম? বিজয় ওদের ওখানে তবু নিজের উপযুক্ত পরিসর, উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পেয়েছে।

তাই মনে করেই আমরা খুশী হতে চেষ্টা করি।

পিকপিক সোমের ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়িতে যে সন্ধ্যা নামে, তেমন সন্ধ্যা বিজয় কোনদিনও দেখেনি। পিকপিক স্বামীর সঙ্গে চায়না ঘুরে এসেছে একবার। বিজয়কে সে বলে—বিজয়, আমাকে ছবি দেখতে শেখাও। ছবি দেখতেই জামি না আমি।

বিজয় পিকপিক সোমের সঙ্গে অক্সফোর্ডের দোকানে যায়। বিদেশী চিত্র-সমালোচকদের বই কেনে বড় বড়। সে সব বই সোমদের ড্রাইভার তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা পিকপিকের বাড়িতে যে সব বাতি জ্বলে, তার আলো চেকোশ্লোভাকিয়ার কাঁচের আধারে নানারকম রঙ ছড়ায়। এ ঘরে পায়ের শব্দ কার্পেটে ডুবে যায়। চীনের দুর্মূল্য পেয়ালায় আসে কফি। ছবি রাখবার ও দেখবার জন্যে আলাদা ঘর বানিয়েছে পিকপিক। সেখানে মৃদু হলদে আলোর নীচে কাঠের স্ট্যাণ্ডে চীনে শিল্পীর ঘাড়-বাঁকানো বুনো ঘোড়ার ছবি রেখে বিজয় আর পিকপিক কোলে হাত রেখে বসে থাকে। চীনে ধূপের সুগন্ধি ধোঁয়া উঠতে থাকে তাদের ঘিরে। ছবি দেখা যখন শেষ হয়ে যায়, পিকপিক বিজয়ের কাছে ঘেঁষে আসে। বলে—বিজয়, কি আছে তোমার মধ্যে? এমন লাগে কেন আমার?

একহাতে বিজয়ের গলা জড়িয়ে, বিজয়ের কাঁধে মাথা রেখে অস্থির হয়ে ওঠে পিকপিক সোম। ছোট ছোট অক্ষরের কথা যেন ছোট ছোট মৌশুমি ফুলের মত ফুটে ওঠে। বয়স তিরিশ হলে কি হবে, মিসেস সোম আজও যৌবনটি ধরে রেখেছে। বিজয়ের অনভ্যস্ত রক্তে কেমন নেশার ঝাঁজ লাগে। ঘাড় আর কান গরম হয়ে যায়। পিকপিক বলে—বিজয়, আমি তোমার জন্য, শুধু তোমারই জন্য, ডিনারে ডাকবো মেহতাকে। কাগজ একটা বের করতে চাইছিলে না তুমি? তুমি ওর সঙ্গে কাগজ কর। ও তোমাকে এডিটরের বোর্ডে রাখবে।

—মেহতার কাগজে?

—আমি যদি বলি, মেহতা সে কথা রাখবে বিজয়। বিজয়, তোমার জন্যে আমাকে এতটুকু করতে দাও।

এইসব কথা শুনতেই তো চাইছিল বিজয়ের প্রাণ। এই হলো শোনবার মত কথা। কি বিনীত করুণ আকুতি যে ফুটে ওঠে

পিকপিকের গলায়—এতটুকু তাকে করতে দিক বিজয়। ছয় শ' টাকার একটা কাজ জোগাড় করে দিতে দিক তাকে। সে শুধু বিজয়ের কাছে এইটুকু চায়।

তার বিনিময়ে কি চায় পিকপিক? সে বিষয়ে এখন আর বিজয়ের কোন সন্দেহ নেই। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের দিকে গড়াচ্ছে। বিজয়ের কাঁধে মুখ রেখে পিকপিক বলে চলেছে—তুমি আশ্চর্য বিজয়, তুমি একটা আগুন! এমন আমি আর কারুকে দেখিনি।

পিকপিকের মুখ থেকে পরিষ্কার হুইস্কির গন্ধ আসে। তবু সবশুদ্ধই ভাল লাগে পিকপিককে।

পিকপিক সোম-এর বাড়িতে সেদিন মেহতার পার্টি। মেহতার সঙ্গে বিজয়ের আলাপ করিয়ে দিয়ে পিকপিক শুধু বলেছে—লক্ষ্মীটি বিজয়, একটু ইম্প্রেস করতে চেষ্টা কর ওকে। লোকটা টাকার কুমীর। আর বাংলাদেশের কালচার এত ভালবাসে। যা কিছু বাংলার, তাই ওর প্রিয়।

বাংলাদেশ সম্পর্কে মেহতার সুগভীর টান শুধু মুখের কথা নয়। এ তার রক্তে আছে বত্রিশ নাড়ীতে বাঁধা। বাংলাদেশের কোলিয়ারি, চাল, পাট, চা, ট্রান্সপোর্ট—সব কিছু, যতদূর পেরেছে, আপন করে নিয়েছে মেহতা। বিজয়ের সম্পর্কে তার আগ্রহ নেই—কিন্তু সেই টাইপিস্ট মেয়েটিকে নিয়ে যে স্ক্যাণ্ডাল হতে পারতো, ডাক্তার সোমের নার্সিং হোমই সে কলঙ্ক মোচন করে বাঁচিয়েছে মেহতাকে। তাই সুচন্দ্রা সোম-এর কথা না রেখে তার উপায় কি?

সে বিজয়কে বলে—আপনাদের মত ছেলেরা এলে তো কাগজের চেহারা বদলে যাবে। আসুন আপনি। আমি খুব খুশী হবো। গরীবের দফতর হচ্ছে গভর্নমেণ্ট প্লেস-এ। একদিন দেখেই যান।

খুব জমেছে পার্টি, এমন সময়ে পিকপিককে কি বললো এসে একজন। পিকপিক বিজয়কে ডেকে নিয়ে এল বাইরে। বলল—কে তোমায় ডাকছেন, দেখ।

ডাকতে এসেছে সুজয় আর তপন। এই বাড়িতে তাকে খুঁজে খুঁজে ডাকবার মত কি প্রয়োজন হল? ভেবে পায় না বিজয়। তপন সুজয়কে কথা কইতে দেয় না। বলে—মেসোমশাই খুব অসুস্থ। এখুনি বাড়ি চল বিজয়দা। ট্যাক্সি এনেছি।

ট্যাক্সিতে উঠে বিজয় সুজয়কে বলে—অসুস্থ? কি রকম অসুস্থ?

জবাব দিতে গিয়ে সুজয়ের মুখখানা কেঁপে কেঁপে ভেঙেচুরে যায়। তপন শক্ত মুখে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। বলে—কোথায় গিয়েছ তা ত' জানি না। দুই তিন জায়গায় খোঁজ করে তবে পেলাম—যদি বলে যেতে বাড়িতে, তাহলে···

—তাহলে কি?

—মেসোমশাইকে দেখতে পেতে।

—বাবাকে দেখতে পেতাম?

বিজয় বলে—কি বলছ তপন? ভাল করে বল। বাবাকে দেখতে পেতাম, মানে?

তপন বিষণ্ণ এবং বিরক্ত মুখে তাকায় বিজয়ের দিকে। বলে—তোমাকে কোথায় না কোথায় খুঁজেছি আমরা। তুমি কোথায় যাও, কি কর, বাড়িতে এরা আজ এক বছর ধরে জানে না।

—কিন্তু বাবার কি হয়েছে? বল তপন। সুজয় তুই কথা বলছিস না কেন?

সুজয় এবার কাঁদে।

তপন বলে—এই ত' এসে গিয়েছি। মেসোমশায়ের করোনারি থ্রম্বোসিস্-এর স্ট্রোক হয়। কোন উপায় ছিল না।

—কোন উপায় ছিল না? বোকার মত বলে বিজয়। তারপর একটা আশঙ্কা, আরব্যোপন্যাসের সেই কলসির দৈত্যের মত ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে মেঘপুঞ্জ হয়ে ঢেকে ফেলে বিজয়ের বোধশক্তি।

আর সে দেখতে পাবে না বাবাকে। তার বাবা, যাঁর মত নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর একটা মানুষ আর হয় না, যাঁর সঙ্গে গত একটা বছর,

এক বাড়িতে বাস করেও দেখা হয়েছে কি হয়নি বিজয়ের—সেই বাবাকে সে আর দেখতে পাবে না।

বিজয় যখন নামলো, আমরা সকলেই ছিলাম সামনে। কুমুদ আর বেলা মাটিতে পড়ে কাঁদছিলো। মাসীমা বসেছিলেন পাথর হয়ে। গোপালবাবুকে তখন বারান্দায় বের করা হয়েছে। তপন বিজয়কে নামিয়ে দিয়েই খাট আর ফুল আনতে গেল।

বিব্রত ও অসহায় বোধ করছিলাম আমরা। একজন ভদ্রলোক বোধহয় পাড়ারই কেউ হবেন—এগিয়ে এসে বিজয়কে বললেন—

—ছুঁয়ে বসে থাকো। তোমারই কর্তব্য।

বিমূঢ় বিজয় তখনই পাশে বসলো। আর বাবাকে সে যেন আজ বহুবছর বাদে প্রথম দেখলো। শীর্ণ বুড়িয়ে যাওয়া দুঃখী একটি মানুষ। সহসা তার মনে হলো, কিছুক্ষণ আগেও যে মানুষটা একান্ত সহজলভ্য ছিলো, এখন আর তাকে সে পাবে না—কথা কইতে পাবে না—ডেকে জাগাতে পারবে না।

তারিখটা মাসপয়লা। সুজয় কাস্টমসে ক্লার্ক হয়ে ঢুকে থেকে জোর করে গোপালবাবুর রাতের টিউশনীটা ছাড়িয়েছে। রাতে টিউশনী নেই—তবু বাড়ি ফিরতে দেরিই হয় গোপালবাবুর। বলেন —পার্কে বসে থাকি। বেশ লাগে।

মাসপয়লার মাইনেটা নিয়ে বেরুবার সময়েই কেমন যেন লাগলো। দপ্তরী বললো—বাবু, মাথাটা একটু ঘুরে গেল কি ?

—সামান্যই।

বলে বেরুলেন গোপালবাবু। কেমন যেন লাগছে। একটু গোলমেলে ভাব। যেমন, নস্যির ডিবেটা আজ হাত থেকে পড়ে গেল। ডেস্কের দেরাজে চাবি দিতে ভুল হয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল—পায়ের নীচটা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। ভাবলেন একটা দোকানে বসে মিষ্টি আর জল খেয়ে নেবেন। পেটটা খালি বলে হয়তো এরকম লাগছে। মিষ্টি কিনতে গিয়ে একটা মিষ্টি

কিনতে কেমন লাগল। ভাবলেন—একটাকায় আটটা সন্দেশ কেনা যাক। বাড়িতে গিয়ে খেলেই হবে। সুজয়রাও খাবে।

সন্দেশের বাক্সটা নিয়ে ফেরবার সময়ে হঠাৎ মনে হল আর হাঁটতে পারবেন না। পার্কে ঢুকে বসলেন। আলো-আঁধারি। বেঞ্চের অপরদিকে বসে আছেন আর একজন ভদ্রলোক।

বসে গোপালবাবুর কেমন মনে হল—শরীরের ভেতরটা যেন থেমে আসছে। পা আর চলবে না, হাত নাড়া যাবে না, নিশ্বাস নেওয়া যাবে না। ভাবলেন, একটু বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বসেছেন, তখন আস্তে আস্তে স্বস্তি বোধ হল। মাথাটা হেলিয়ে দিলেন গোপালবাবু। খুব আরাম বোধ হল। মনে হল এমনি করে অল্প কিছুক্ষণ থাকলেই তাঁর ভাল লাগবে। তিনি বাড়ি চলে যেতে পারবেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হল ছোট একটা পাঁচ বছরের ছেলে তাঁর হাত ধরে টানছে। তার হাসি হাসি মুখ। এ মুখ তো বিজয়ের। বিজয়ের ছোটবেলার মুখ। কি বলছে তাঁকে বিজয়?

—বাবা, তুমি এত দেরি করে এসেছ কেন? আমার কষ্ট হচ্ছিল।

গোপালবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর ছেলে বিজয় তো লম্বা চওড়া চেহারা—ছাব্বিশ বছরের যুবক—রীতিমত ভদ্রলোক। তাঁর মত হতভাগা বাপের ছেলে বলে মনেই হয় না। বিজয় এত ছোট হলো কি করে? তিনি না এলে বিজয়ের কষ্ট হয়? সে কোন্ বিজয়? তাঁর ছেলে, না আলো-আঁধারে একটা কুহেলী মাত্র?

গোপালবাবুর মনে হয় তিনি একটা ভীষণ বিপদে পড়েছেন। এমন সব আবোল-তাবোল কথা মনে হচ্ছে কেন? মনে হয়, জোর করে উঠে পড়তে হবে। বাড়ি চলে যেতে হবে। স্ত্রীর কাছে যেতে হবে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে বাড়ি। কিন্তু ওরা কি জানে যে, কাছেই পার্কে এমন একটা বিপদে পড়েছেন তিনি।

জোর করে উঠতে যান তিনি। খুব জোর করেন। কিন্তু

ততক্ষণে শরীরটা অবাধ্য হয়ে গিয়েছে। পা-ছুটো কথা শোনে না। শরীরটা উঠতে চায় না। জোর করে চেষ্টা করতে গিয়ে সমস্তটা গোলমাল হয়ে যায়।

পাশের ভদ্রলোক লক্ষ্য করেছিলেন, গোপালবাবুর মাথাটা কেবলই ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—ও মশাই, অসুস্থ বোধ করছেন?

সাড়া পান না। গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে যান। গোপালবাবু কেমন টলে যান। সন্দেহ হয় ভদ্রলোকের। ছুই একবার ধাক্কা দিয়ে ডেকেই তিনি ভয় পান। আশপাশের লোককে ডাকেন। ছেলেরা সহজেই চেনে—সুজয় কুমুদের বাবা। তারা ডাকে—মেসোমশাই কি হলো? মেসোমশাই?

তাদের হাতের ওপরেই আরো ঝুঁকে পড়েন গোপালবাবু। সন্দেশের বাক্স মাটিতে পড়ে সন্দেশ ধুলোয় মাখামাখি হয়ে যায়।

আমরা সব করলাম। পাড়ার ছেলেরা সবাই এল। সুজয় যতবার কান্নায় ভেঙে পড়তে চেয়েছে, তপন তাকে নিয়ে আনুসঙ্গিক সব ব্যবস্থার মধ্যে তাকে ব্যস্ত রেখেছে।

মাসীমা কিন্তু কাঁদতে পারেন নি। চুপ করে বসেছিলেন—স্বামীর দিকে চেয়ে—শূন্য চোখে। সামনের কোন কিছু, এত যে ঘটনা ঘটছে, এতগুলো মানুষ যে চলাফেরা করছে—কোন কিছুই যেন তাঁর চোখে পড়ছিল না।

অনাদি আমাকে ডেকে বললো—পাড়ার গিন্নীবান্নী কেউ নেই? ওঁর কাছে যে থাকা দরকার। এমন একলা থাকা কি ভাল? একটুও কাঁদছেন না পর্যন্ত!

বিজয়কে আমরা সঙ্গে নিলাম। সে-ও কম হতবুদ্ধি হয়নি। সবটা যেন তার মাথায় ঢুকছিল না।

আমরা যখন গোপালবাবুকে তুলে নিয়ে যাব—তখন মাসীমা

দীর্ঘ, তীব্র একটা হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন—তুমি আমাকে রেখে একলা কোথায় যাচ্ছ? অজ্ঞান হয়ে গেলেন মাসিমা।

আমরা তো রইলামই—মাধবী খবর পেয়ে এলো বিজয়ের বাড়ি। সে যে কোনদিন আসেনি—এ বাড়িতে যে বিজয়কে ছাড়া আর কাউকে সে চেনে না—সে সব তুচ্ছ কথা মাধবী মনেই রাখলো না। বেলাকে সে সান্ত্বনা দিলো বড় দিদির মত। বিজয়ের মাকে সে শরবৎ করে খাওয়ালো। জোর করে তাঁকে তুলে হবিষ্যান্ন রান্না করালো। স্নান করে এ বাড়িতে এসে, সেই গুছিয়ে দেয় সব উপকরণ। সুজয়দের ডেকে ডেকে খাওয়ায় জোর করে। বিজয়কে বলে—শক্ত হও তুমি। তোমাকেই ত' এখন সব দেখতে হবে বিজয়!

বিজয় কি তখনো বোঝেনি? কেন যে মাধবী এমন করে আসে, কেন তার পরিবারে এমন করে মিশতে চায়—সে কথা কি মাধবীর মুখে চোখে প্রতি ব্যবহারে লেখা ছিল না?

গোপালবাবুর শ্রাদ্ধের দিন মাধবী সকাল থেকে এসে কত যে কাজ করল!

বিজয়ের মা মাধবীকে দেখে মুগ্ধ। এমন একটি মেয়ে তিনি আর কখনও দেখেননি। কি সুন্দর বিনীত ব্যবহার, কি রকম মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করে। মাধবী যে বিজয়কে ভালবাসে, মা-র সে কথা বুঝতে দেরি হয়নি। তিনি বেলাকে বলেছিলেন—এমন একটি মেয়েকে যদি পাই, আমার ঘরে দোরে যেন লক্ষ্মী ফিরে আসে। কিন্তু তোর দাদা কি অমন মেয়ের মর্যাদা বুঝবে?

বেলা বলেছিল—মা, দাদাও নিশ্চয় মাধবীদিকে ভালবাসে। নইলে মাধবীদি এমন করে আসতে পারত না।

মাধবী ধরে নিয়েছিল, বিজয় যদিও তাকে তেমন করে কিছু বলেনি, তবু এর পরে আর বলা-কওয়ার দরকার করবে না। নিজের মন থেকেই সে কেমন করে যেন প্রশ্রয় পেয়েছিল। কেমন করে, তা মাধবী বলতে পারবে না। তার ধারণা হয়েছিল, বিজয় সবই বুঝেছে। সবই জেনেছে। এবার যেদিন সে বলবে—বিজয়, আমি যাই। আর ত' আমার আসবার, থাকবার দরকার হবে না? বিজয় তখন বলবে—কোথায় যাবে মাধবী? তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন।

এইসব ভেবেছিল মাধবী।

মাধবী, অরুণ, এদের দেখে দেখে তাই আমার ধারণা হয়েছে, প্রেম সাধারণত মানুষকে অন্ধ করে। চোখ খুলে দেয় না।

বিজয় এতদিন যে তাকে এড়িয়ে চলেছে—দেখা করেনি—এতদিনের এত অবহেলা, মাধবী কিছুই মনে রাখল না। অশৌচের জন্য মুখে দাড়ি গজিয়েছে, খালি গায়ে চাদর জড়িয়ে কম্বলের আসনে বসে আছে বিজয়—তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর মতো এই চেহারা যেই সে দেখল, অমনই সমস্ত দুঃখের কথা ভুলে মাধবীর হৃদয় প্রেম ও মমতায় ভরে উঠলো। বিজয়কে এমন সুন্দর মাধবী আর কোনদিন দেখেনি।

তবু বিজয় যেন বলতে চায় না কিছু। না বলুক, মাধবী নিজেই বলবে। বিজয়ের কাছে তার লজ্জা কি? বিজয় এত বড়, এত উঁচু, যে তার কাছে ছোট হতে, উপযাচিকা হয়ে ভালবাসার কথা বলতে মাধবীর এতটুকু লজ্জা করবে না। বিজয় তার সকল লজ্জা ঢেকে দেবে।

বিজয় কিছু না বলতেই, মাধবী নিজের মনে বিজয়ের হয়ে প্রশ্ন করলো। নিজের হয়ে জবাব দিল। এমনি করে সে ঠিক করে নিল, বিজয়কে সে-ই সব বলবে।

মাধবী যে এই ধরনের কোন মীমাংসায় উপনীত হয়েছে মনে মনে —মাধবী যে বিজয়কে নিজেই বলবে সব—অরুণ বলে, সে মাধবীর মুখ-চোখেই তা বুঝতে পেরেছিল। অরুণ বলে—গোপালবাবুর শ্রাদ্ধের দিন, মাধবীকে যখন দেখলাম ওদের বাড়িতে, আমার মনে মনে যেন তখনি জানলাম। জানব না কেন বল বাদল—মাধবীর মুখ দেখে তার মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করা ছাড়া আর তো কিছু করিনি অনেকদিন। ওকে যেন আমি বুঝতে পারি। ও আমাকে বলল, অরুণ তোমরা এসেছ? স্নান করতে গিয়েছে বিজয়। দেখ না, ওর কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যেই বললো, আমার যেন মনটা কি রকম হয়ে গেল। বাদল, আমার ইচ্ছে হল যে ওকে বারণ করি বলি, এমন কাজ তুমি করো না মাধবী—তুমি দুঃখ পাবে।

শুধু চিন্তা করেই ক্ষান্ত থাকেনি অরুণ। সেইদিন মাধবীর তার প্রতি বিরূপ মনোভাব জেনেও, সে আবার বলেছিলো বাড়ি ফেরবার পথে—মাধবী, একদিন আমার কথা তুমি শেষ করতে দাওনি। আজ আবার সেই কথাই বলি মাধবী। মাধবী, তুমি আমাকে বিয়ে করবে? আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্য সম্মান দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করবো।

মাধবী অরুণের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই নেই। মাধবী বলল—অরুণ, তুমি কি জান না আমি কাকে ভালবাসি? বিজয় তোমারও বন্ধু। তারপরেও তোমার এ কথা বলা উচিত?

কিন্তু বিজয় তো তোমাকে ভালবাসেনা মাধবী—বিজয় তোমাকে কেন, কাউকে ভালবাসেনা—এ কথা মুখে এলেও বলতে পারেনি অরুণ। মাধবীর দীপ্ত মুখখানার দিকে চেয়ে, একথাও সে বলতে পারেনি—মাধবী, শুধু আমার জন্য নয়, তোমার যে বুকখানা ভেঙে দেবে বিজয়, সেই বেদনা, সেই আঘাত আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম তাই আমি এই প্রস্তাব করলাম।

মাধবী চলে গিয়েছিল তার বাড়ির পথ ধরে। আর তার দিকে চেয়ে চেয়ে অরুণের মনে হয়েছিল—বহু যুগ, বহু বছরের ক্লান্তি যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। নিজেকে এমন ক্লান্ত, পরাজিত ও অক্ষম তার আগে বা পরে কোনদিন মনে হয়নি।

মাধবী বিজয়ের কাছে গিয়েছিল নিজেই নিজের মনের কথা বলতে।

সেদিন যে কি হয়েছিল, আমি তা জানতাম না। বিজয়ের বাড়িতে আমি আসছিলাম। মাধবী আমার সামনে দিয়ে, আমাকে না দেখে, কারুকে না দেখে রাস্তা দিয়ে চলেছে—চোখের জলে ভিজে গেছে গাল—ছুটে গিয়ে সে একটা রিক্সায় উঠল, এটুকু শুধু দেখেছিলাম।

আর অনেকদিন পরে বেলা আমাকে বলেছিল—কি হয়েছিল, না হয়েছিল সব।

সেদিন দুঃখ হয়েছিল মাধবীর জন্য। আজ দুঃখ হয় বিজয়ের জন্য। বিজয় যদি সেদিন মাধবীকে প্রত্যাখ্যান না করতো, হয়তো তার জীবনটা অন্য পথে যেত। হয়তো, আজ বিজয়ের কথা এমন করে বলবার প্রয়োজন হতো না।

মাধবী গিয়েছিল একদিন সকালে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল—মাসীমা, বিজয় আছে?

—ওপরে আছে মা, যাও।

বিজয়ের মা লক্ষ্য করেছিলেন আজ মাধবীকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। হাল্কা হলুদ শাড়ি, সাদা জামা—আজ মাধবীর কানে একটু গহনার ঝিলিক, খোঁপায় একটু ফুলও দেখা যাচ্ছে। মেয়ে হয়ে মেয়ের মন দিয়ে বুঝেছিলেন, এর পেছনে আছে কোন প্রত্যাশা। তাতেই মাধবীকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে।

বিজয় বসে লিখছিল, তার নতুন কাগজের জন্য। মাধবীকে

দেখে সে চেয়ে রইল ভ্রূ কুঁচকে। মাধবী বসল একপাশে। এ কথা সে কথার পর আস্তে আস্তে বলল—বিজয়, অরুণ আমাকে বিয়ে করতে চায়।

—আচ্ছা।

—বিজয়, তোমার কিছু বলবার নেই? কিছু বলতে পার না তুমি?

—কি বলব মাধবী?

মাধবী অধর দংশন করল। বিজয় সবটুকু কথা তাকে দিয়েই বলাতে চায়। নিজে কিছু বলতে চায় না। বেশ, মাধবীই বলবে। বিজয় ঐ রকম ধরাছোঁয়ার অনেক উপরেই থাক। ঐ উদ্ধত নির্লিপ্তিকেই ভালবেসেছে মাধবী। বিজয়ের কথার রূঢ় রুক্ষ সুরে তাই অপমানিত হয় না মাধবী। আরো যেন নিবিড় বোধ করে। বলে—তবুও ত' সব কথা বলা হল না বিজয়! আমি এ বিয়ে চাই না। তুমি ত' জান, আমি তোমার জন্য···তোমার কথার জন্য কতদিন অপেক্ষা করে আছি!

কথা শেষ করে মাধবী আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে। দুই চোখ ছল ছল করে বিজয়ের হাতখানা সে ধরতে চায়। নিজের হাত দু'খানা ঘামতে থাকে।

বিজয় এবার মাধবীর দিকে তাকায়। অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি সার্চলাইটের মত তীব্র আলো ফেলে মাধবীর হৃদয়টা তন্নতন্ন করে দেখে। মাধবী বলে—বিজয়, কিছু বল?

বিজয় বলে। ধীরে, মেপে মেপে, ঠিকমত কথাগুলি বেছে বেছে। বলে—তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে, হয়তো অনেকের চেয়ে বেশী আছে, তাই বলে তোমার সম্পর্কে বিশেষ করে কোন আগ্রহ আমার আছে কি? তাই ভাবছিলাম মাধবী। না। তোমার সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ আমি খুঁজে পাচ্ছি না—আমি দুঃখিত।

—কি বললে বিজয়?

মাধবী যেন বুঝতে পারেনি বিজয়ের কথা। বিজয় এবার বোঝে যে, তার কথাগুলি মাধবীকে মর্মান্তিক আঘাত করেছে। বুঝে সে বিভ্রান্ত বোধ করে। বলে—মাধবী, আমি সত্যিই বুঝিনি, যদি বুঝতাম—হয়তো তোমাকে এই দুঃখের থেকে অনেক আগেই মুক্তি দিতে পারতাম!

—কিসের থেকে, বিজয়?

—আহা, এইসব ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাপার ত' হতো না!

—বিজয়, তুমি কি বলতে চাইছ?

সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজের মুখখানা আড়াল করে ফেলে বিজয়। তারপর বলে—

—মাধবী, অরুণ আমার বন্ধু। আর অরুণ সত্যিই খুব ভাল ছেলে। আমার মনে হয়, সে তোমাকে অসুখী করবে না। আমার কাছ থেকে তুমি কি উত্তর চাও জানি না মাধবী—তবে আমি, আমি ত' এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারছি না···আমায় তুমি ক্ষমা ক'রো মাধবী।

বলে সামান্য হেসে চেয়ে থাকে বিজয়। মাধবী হাসতে পারে না। রক্তশূন্য মুখে সে উঠতে চেষ্টা করে। বেরোবার জন্যে দরজাটা হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে।

বিজয় তবু যেন বোঝে না। সে বলে চলে—তোমাকে ত' অনেকদিন থেকেই দেখছি—আমার মনে হয়নি মাধবী। কোনদিন মনে হয়নি যে তুমি···আজ শুধু আশ্চর্যই বোধ করছি। আর তোমাকে কেন, কারুকে বিয়ে করবার কথা আমি ভাবতে পারি না। তুমি ত' জান কত উচ্চাশা আমার—

—কত উঁচু তোমার উচ্চাশা বিজয়, যে আমি তার নাগাল পাব না?

—সে কথা নয় মাধবী, তুমি আমাকে বিব্রত করছ। কেমন করে আমি তোমাকে বোঝাই?

—যে আমাকে তুমি···

—ভালবাসি না—

—থাক বিজয়, চুপ কর।

—কিন্তু মাধবী, তুমি যে দুঃখ পাচ্ছ···

—সেদিকে চেওনা বিজয়—আর কোনদিন তোমার সামনে আসব না···

মাধবী শুধু দরজাটা খোঁজে। হাতড়ায় দেয়ালে। দেয়াল ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

এতক্ষণে দাঁড়াতে পেরেছে মাধবী। খুঁজে পেয়েছে দরজাটা। চোখের জলে মুখখানা তার মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। চূড়ান্ত অপমানে মুখ হয়ে গিয়েছে ছাইরঙা। বেরিয়ে যেতে যেতে মাধবী শুধু একটা কথাই বলতে পারল—ভগবান করুন বিজয়, এর প্রতিদান তুমি যেন পাও!

এর লাগসই জবাব বিজয় খুঁজে পাবার অনেক আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল মাধবী।

তার জন্যে চা-খাবার নিয়ে উঠছিলেন বিজয়ের মা। তাঁকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে একবার রেলিং একবার দেওয়াল ধরে অন্ধের মত টলতে টলতে বেরিয়ে গেল মাধবী।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিজেকে বাঁচালেন বিজয়ের মা। নইলে পড়ে যেতেন। হাতখানা তাঁর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। বুঝতে বাকি রইলো না, একদিন যেমন তার বাপের মনটা অবহেলে ভেঙে দিয়েছিলো তাঁর ছেলে—আজ ঐ মেয়েটির বুকও তেমন করেই সে ভেঙে দিয়েছে।

পাঁচ

মেহতার কাগজে ঢোকে বটে বিজয়, কিন্তু সে যেন কিছুই নয়। আরো বড়, আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সে। অফিসে যায়, যেন খানিকটা মেহতাকেই খুশি করবার জন্য। আসলে যেন এর কোনটাই সিরিয়াস নয়। ইচ্ছেমত যায়, ইচ্ছেমত কামাই করে। আজ স্থাপত্য, কাল নন্দনতত্ত্ব, পরশু দাক্ষিণাত্যের নৃত্যকলা, তরশু মহীশূরে চন্দন গাছ বিলুপ্ত হচ্ছে কেন—এইসব নিয়ে বড় বড় ফুটনোট-কণ্টকিত প্রবন্ধ ছাপায় কাগজে। বিশেষজ্ঞরা প্রতিবাদ-পত্র লিখে বিজয়ের সঙ্গে মুকাবিলা করতে চান। এডিটর ডেকে পাঠালে বিজয় তাঁকে গিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আসে বড় বড় কথা।

পিকপিককে সন্ধ্যাবেলা বলে—কি জানো? শিক্ষিত লোকে খবরের কাগজে ঢুকলে পরে লেখাপড়া ভুলে যায়।

পিকপিক বলে—ঐ পাঁচশো টাকাটাই যা লাভ!

বিজয়ের টাকা সংসারের কাজে যায় না। তাতে অনেক টাকার বই আসে অক্সফোর্ড-এর দোকান থেকে।

বাজিমাৎ করবার জন্য বিজয় নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্-এর ওপর নিজেই এক দুরূহ সমস্যা আবিষ্কার করে, নিজেই তার মীমাংসা করবার জন্য মস্ত এক বই ফেঁদেছে।

অতএব তার ক্যামেরা প্রয়োজন হয়, টেপ-রেকর্ডারের দরকার হয়—ট্যাক্সি ছাড়া সে চলতে পারে না। পিকপিকের জন্মদিনে একশো টাকা দিয়ে অ্যাকোয়ারিয়াম কিনে দিয়ে আসে।

মেহতা বলে—মিসেস সোম, আপনার বিজয় দাশ বড় হাইব্রো, সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না।

পিকপিক হাসে। বলে—ওকে সকলে বুঝতে পারে না। ওকে বুঝতে পারাও একটা সৌভাগ্য কিনা!

'সিলেক্ট'-এর সান্ধ্য অধিবেশনে বিজয় যখন তার নতুন বইয়ের পরিচ্ছেদ পড়ে শোনায়, পিকপিক সোমের হাতটা জড়িয়ে থাকে তার গলায়। লতিকা রায় বলে—পিকপিক, তুমি তোমার একচেটিয়া করে ফেললে ওকে?

পিকপিক উঠে গিয়ে লতিকার কাঁধে হাত রাখে। বলে—ডার্লিং, জান না, ও রকম একটা মানুষের সঙ্গে প্রেম করা কি নতুন একটা অভিজ্ঞতা।

লতিকা রায় বলে—তবে বিজয় দাশের অবস্থা সঙ্গীন বলো?

—কেন, বুলা?

—তুমি যখনই যাকেই বলেছ, এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা—তখনই তার মেয়াদ ফুরিয়েছে। দেখলাম তো!

—বড় দুষ্টু তুমি ডার্লিং—বলে চলে গিয়েছে পিকপিক।

বিবলি-বুলা-পিকপিকদের সঙ্গে সময় যেন উড়ে চলে যায় বিজয়ের। খেয়াল থাকে না কোন কিছু।

তার পরিবার, তার স্তরের সকল বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের থেকে সে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, যে এক একটা দিন চলে যায়, বিজয়ের কারু কথাই মনে পড়ে না।

মা আর ভাইরা তাকে যে নিজেদের মধ্যে নিজেদের ক'রে পাবে সে আশা কবে ছেড়ে দিয়েছে।

এমনি করে নিজের স্তর ভুলে, একটা অন্য জগতে বাস করতে করতে বিজয় যেন তার জগতের মানুষদের দুঃখবেদনার কথাও আর বুঝতে পারে না। গদী আঁটা চেয়ারে বসে তার নিজেকে মনে হয় অসীম শক্তিশালী। আজ এই এয়ারকণ্ডিশান্ড ঘরে কাঁচের ভারী দরজা ঠেলে যদি কোন মানুষ দুঃখকষ্টের আবেদন নিয়ে ঢোকে, বিজয় যেন তাদের চিনতে পারে না।

যেমন হলো সেই সিনেমার এক্সট্রা মেয়েটির বেলায়।

কাগজের অফিসে দিলীপের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক একটি ছেলেমানুষ মেয়েকে নিয়ে এসে বসে থাকেন বিজয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। বলেন—এইটি আমার মেয়ে। নাম কমলাবালা সরকার। সম্প্রতি দুটো একটা ছবিতে অভিনয় করেছে। রোল সামান্যই। স্ক্রীনে একমিনিট দেড় মিনিটের বেশি থাকেনি। তা, এখন আর ডিরেক্টররা কাজ দিতে চাইছেন না কমলাকে। দিলীপবাবু আপনার নাম করলেন। আপনাদের কাগজের ত' নাম আছে! যদি ওর একখানা ছবি ছাপিয়ে দুই চার লাইন লিখে দেন···

বিজয় কথা শুনতে শুনতেই ফোন তুলে নেয় হাতে। বলে—আমি এখন ব্যস্ত। পরে আসবেন।

—হ্যাঁ নিশ্চয়। তবে থাকি অনেক দূরে কিনা—বুঝতেই ত' পারেন—সেই নাগেরবাজার কলোনি থেকে···বুড়ো মানুষ···

বিজয় সব কথা শোনে না পর্যন্ত। যাঁর মেয়ে সিনেমাতে এক মিনিটের এক্সট্রা—তাঁর হয়তো এতদিনে অবমাননায় অভ্যস্ত হয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু তবু তিনি আহত হন। শীর্ণ মুখখানা কেমন যেন হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ান তিনি। সস্তা জামা, সস্তা শাড়ি পরা ছোটখাটো সে মেয়েটি বাপকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

আবার আসে মেয়েটি। বাপকে আর আনে না। এবার সে ছবি এনেছে। একটা ছবিতে বিয়ের শাঁখ বাজাচ্ছে এক ঝাঁক মেয়ের সঙ্গে, আর একটা ছবিতে চামর দোলাচ্ছে লক্ষ্মীজনার্দন বিগ্রহের মাথায়। বিজয়ের সামনে ছবিগুলো রেখে বসে থাকে। বিজয় বলে—সুচরিতা কে?

লাজুক হেসে মেয়েটি বলে—আমারই নাম। কমলাবালা নামটা তেমন ভাল নয়, তাই ডিরেক্টর বদলে দিয়েছেন।

—ও, তা আমি আপনার কি করতে পারি?

মেয়েটি যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। শাড়ির আঁচল খুঁটতে খুঁটতে বলে—বড় কষ্ট আমাদের। ডিরেক্টর টাকা দেন দশ পনেরো করে। তার থেকে আবার টাকা দিতে হয় মোহনবাঁশীকে। হাতে আমাদের কিছু থাকে না।

—মোহনবাঁশী কে ?

এক্সট্রা মেয়েদের জীবনে মোহনবাঁশীই সব। ম্যাডান ও পার্শী থিয়েটারের যুগে সখীদল রিক্রুট করে এদের হাতেখড়ি। কাঁচুলির ওপর আঙুল দিয়ে ইশারা করে সখীদল থিয়েটারের দর্শকদের মন ভোলাতো।

মন খুশি হলে দর্শকরা থিয়েটার ভাঙলে পরে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে সখীদের নিয়ে কুঞ্জে যেত। থিয়েটারে দশ পনেরো টাকা মাইনে পাবার ক্ষতিটা এমনি করে পুষিয়ে যেতো।

মোহনবাঁশীরা পরের ওপর বাঁচে। তখন মোহনবাঁশীরা এইসব সখীদের বাবু-বাছাইএ সাহায্য করে পাঁচ-দশ টাকা কমিশন নিতো মাস গেলে।

এখন অবশ্য সেদিন নেই। এখন মোহনবাঁশীরা এমনি করে কলোনি থেকে, এখান সেখান থেকে গরীব মেয়েদের জোগাড় করে আনে। এক স্টুডিওতে বিয়ের সিনে শাঁখ বাজাবার পরই গরু তাড়িয়ে নিয়ে যায় অন্য স্টুডিওতে। সেখানে পৌরাণিক ছবিতে তারা কৃষ্ণর সামনে গোপিনী সাজে। আবার তারপর মাঝরাতে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে অন্য কোন সামাজিক ছবিতে বিধবা ঝি সাজিয়ে বাবুর সামনে ফলের থালা ধরিয়ে দেয় এদের। এদের দিন-রাত নেই, স্নান-আহার নেই, রূপ-যৌবনের কোন স্বীকৃতি নেই। যে মোহনবাঁশী এমনি করে ডাল ভাত রেশন আর বখাটে দাদার সিনেমার খরচের সংস্থান করে দেয়, সে মোহনবাঁশীকে খুশি রাখতে হয় বইকি !

কমলাবালা বলে—বড় কষ্ট করে দিন যায়। চান্স পাই না।

ছোটখাটো চারপাঁচ দিনের একটা রোলও পাই না। কি করে চলে বলুন? চলে কি?

—তা, আমাকে কি করতে হবে?

—আপনি শিক্ষিত লোক, বিদ্বান লোক, আমার কথাটা যদি বেশ করে লিখে দেন কাগজে, ছবি ছেপে দেন একটা—তবে একটু সুবিধে হয়।

—আচ্ছা, ছবি রেখে যান। পরে আসবেন।

কমলাবালা আবার আসে। আবারও আসে। সারারাত স্টুডিওর ফ্লোরে মশার কামড় খেয়ে, ঘর-ফিরতি ট্যাক্সিতে মোহনবাঁশীর কদর্য কামনার অত্যাচারে চোখের জল ফেলে তারও পরে এসে বসে থাকতে যেন মরে যায় ক্লান্তিতে। গদীমোড়া চেয়ারে যে ভগবান বসে থাকে, তাকে প্রসন্ন করতে পারে না।

অন্য কারুকে ধরে ক'রে তারই সঙ্গের এক্সট্রা মেয়েরা ছবি ছাপিয়ে নেয়। দুইকলম লিখিয়ে নেয় নিজেদের নামে। তারা সুযোগ পেয়ে যায়। কমলাবালার কিছু হয় না। একদিন তাকে বিজয় বলে—তুমি কেন এসে নিত্য নিত্য জ্বালাও বল তো? এটা খবরের কাগজের অফিস—এটা স্টুডিওর ফ্লোর নয়। ওরকম পোশাক করে তুমি আর এস না।

কমলা সেদিন ভেঙে পড়ে বিজয়ের হাঁটু ধরে কাঁদে। বলে—দয়া করুন আমাকে। দয়া হয় না আপনার? একটু লিখে দেবেন, একখানা ছবি ছাপিয়ে দেবেন, সেই আশায় যে কবে থেকে ঘুরে ঘুরে মরছি!

—সম্ভব নয়। তুমি এসো! আমার অন্য কাজ আছে।

কেঁদে কেটে একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে চলে যায় কমলাবালা। বলে যায়—আপনারা শিক্ষিত লোক, বিদ্বান! আপনারা এইরকম? গরীবের কেউ নেই?

মেহতা ব্যাপারটা অন্যভাবে নেয়। বিজয়কে বলে—আপনি

এদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেন না কেন? কেন এ মেয়েটি বারবার আসতো এখানে? অফিসে এরকম চ্যাঁচামেচি হওয়া তো ঠিক নয়!

বিজয় তাঁর সঙ্গে তর্ক করে।

এডিটর বলেন—তিনমাস আগেই আপনি মেয়েটিকে মৃগেনবাবুর ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারতেন বিজয়বাবু। সিনেমা বা স্টেজ-সংক্রান্ত রাইট-আপ্ গুলো ত' তিনিই লেখেন!

বিজয় অপমানিত বোধ করে। অপমানিত হওয়া যার অভ্যাস নেই, তার পক্ষে এই সব কথাবার্তা হজম করা বড় কঠিন। সে যে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে, এই মর্মে চিঠি লিখে মেহতার টেবিলে ফেলে দিয়ে সে বেরিয়ে আসে।

'সিলেক্ট' ক্লাব বলে—দরকার কি বিজয় তোমার ঐ কাগজে সময় নষ্ট করবার? তুমি তোমার বই লেখ। ছাপাব আমরা।

পিকপিক সোম বলে—বিজয়, আমি কিন্তু খুব খুশী হয়েছি। আমার যে কি অসহ্য লাগতো, ওখানে তুমি···ঐ পরিবেশে···

বিজয়ের মনটা যেন ভরে ওঠে। বলে—তুমি ছাড়া আমাকে কেউ বুঝতে পারে না। বুঝলে?

শুধু কি বাইরের মানুষের বেলাতেই বিজয়ের এই ঔদাসীন্য? এই নিষ্ঠুর বিরাগ? ঘরের মানুষগুলির সঙ্গে তার এক দুস্তর বিচ্ছেদ রচিত হয়েছে। তারা দুই পৃথিবীতে বাস করে।

কুমুদ চাকরির পেছনে ঘুরছে দিনরাত। একদিন সে বিজয়কে বলে—দাদা, সঞ্জয় সোম এত বড় একটা কোম্পানির ডিরেক্টর—স্টেনো নেবেন ওঁরা। আমিও দরখাস্ত দিয়েছি। তুমি যদি একটু বলে দাও দাদা, কাজটা হয়তো আমার হয়ে যায়। নইলে ওঁরা আমার মত নতুন স্টেনোর দরখাস্ত দেখবেনই না।

বিজয় বলে—স্টেনোর কাজ? মাইনে হয়ত দেড়শো বা দুশো—সেই কাজের জন্য আমি বলব? আমি পারব না।

আর বলে না কুমুদ। সামনে বসে বিজয়ের এ ব্যবহারে আমি যেন লজ্জায় মরে যাই। বলি—বিজয়, কুমুদের কাজের জন্য তুমি বললে যদি কাজটা ওর হয়, তা তুমি বলতে পার না ?

—তুমি বুঝবে না বাদল। আমার ভাই হয়ে একটা স্টেনোর কাজের জন্য বলা—সে আমার ভীষণ বাধবে। পারব না আমি কিছুতেই। তুমি বুঝতে পারছ না, ওদের বাড়িতে কি পজিসন্ আমার। সেটা কোথায় নেমে যাবে, ভাবতে পারছ ?

আমি চেয়ে থাকি এই অপরিচিত মানুষটির দিকে। বলি—তাঁদের আর তোমার অবস্থা যে সমান নয়, তা কি তাঁরা জানেন না ?

আমার প্রশ্নের জবাবে বিজয় বিব্রত বোধ করে। বলে—

—সমান না হোক, তবে এমন অবস্থা যে আমারই ভাই ওখানে স্টেনো হতে চায়-এ কথা ত' তারা জানেন না! তুমি বুঝতে পারছ না বাদল!

আর কিছু বলি না। নেমে এসে কুমুদকে বলি—আমি দিলীপকে দিয়ে বলাবো সঞ্জয় সোমকে। তোমার দরখাস্তের নকল একটা আমাকে দাও।

কুমুদের মা-র কাছে বসি ছুই দণ্ড। মাসীমা রান্না করছেন কুপী জ্বেলে। বেলা বাটনা বাটছে। মাসীমার মুখের সব কথা যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। বেলার রংটা ফর্সা ছিল। এত ফর্সা ছিল না। বুঝতে দেরি হয় না, ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে বেলা।

ভোর থেকে রাত অবধি এই সংসারটিকে এখন সে-ই চালায়। কাজ করতে করতে নাকি মাসীমার বুকে ফিক ব্যথা ধরে। কাজ করতে পারেন না। বেলা তার ক্লাস টেন-এর বিদ্যা নিয়ে ভোরবেলা একটা ডেয়ারী ফার্ম-এর হয়ে দুধের হিসেব রাখার কাজ ছাড়া আর কিছু পায় নি। সেও পঁচিশ টাকা আনে সংসারে।

আমিও কিছু বলবার পাই না। বোবা একটা দুঃখ, অহেতুক একটা আক্রোশ বিজয়ের প্রতি—আমার গলা চেপে ধরে।

মাসীমা কড়াই চড়িয়ে দিয়ে ফোড়ন দিতে দিতে বলেন—বাদল, তোমরা ত' বাবা আমার ছেলের চেয়ে বেশী। ছেলেকে দিয়ে ত' এসব কাজ হবে না। বেলার জন্যে একটি ছেলে দেখে দেবে?

—দেখব মাসীমা। বলে উঠে পড়ি। বেরিয়ে এসে অরুণের বাড়িতে যাই। মনটা উত্তপ্ত বলেই অনেক কথা বলে ফেলি। বলি—আমার সঙ্গতি থাকলে আমিই বিয়ে করতাম মেয়েটিকে। মাসীমা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

অরুণ চুপ করে শুনে যায়। শুধু বলে—বড় কষ্টে পড়েছে পরিবারটা। কিছু করতে পারি না—তাই মিছিমিছি যেতে ভাল লাগে না।

আমি বলি—বিজয়টা এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন?

অরুণ চুপ করে থাকে। বলে—এরকম হয়ে যাচ্ছে, না, এরকমই সে বরাবর ছিল—আমার যেন বুঝতে ভুল হয়ে যাচ্ছে বাদল।

মাধবীর কথা সেও বলে না, আমিও বলি না। আর মাধবীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শীঘ্রই। তার বাবা বিয়ে দিচ্ছেন দেখে শুনে। মাধবী নাকি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপও করতে চায়নি। বলেছে—তোমরা যা করবে তাই আমি মেনে নেবো। আমার আলাদা করে কিছু বলবার নেই।

আমাদের কাছে নয়, তপনের কাছে বলেছে স্বাতী। স্বাতী মাধবীর বুঝি কিরকম বোন হয়। মাধবী বলেছে—আমি নিজের ভাবনা আর ভাবব না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার।

স্বাতীর কাছ থেকে শুনে তপন এসে কথাপ্রসঙ্গে এ-কথা বলে অরুণকে। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে মাধবীর, তিনি ভালো চাকরি করেন, একটু বয়স হয়েছে—সাধারণ মানুষ। মাধবী না কি তা জেনে বলেছে—তাই ভালো। ব্যক্তিত্ব পূজার শখ আমার মিটে গিয়েছে।

অরুণ মাধবীর কথা বলে না। বলে—তপনকে বলব এখন বেলার জন্যে খোঁজ-খবর করতে। ওর ত' চেনাশোনা অনেক।

তপন বাড়িতেই ছিল। তাকে আমিও বলি। তপন অমনি বলে—নিশ্চয়, আর ভাবতে হবে না তোমাদের।

সকলের ভাবনা নিজের ঘাড়ে নিয়ে আশ্বাস দিতে তপনই পারে। সম্প্রতি ইলেকট্রিকের সাজসরঞ্জামের কি দোকান খুলবে বলে ঘুরছে সে। ভাঙা একটা রেডিওতে তার জুড়ে বাজনা বাজাতে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে—

—তোমরা এতগুলো ছেলে কি করছ? তোমরা কেউ বিয়ে করতে পার না? না কি সবাই বিজয়দা হবে? সত্যি দাদা, তোমাদের গ্রুপটা একেবারে যাচ্ছেতাই, হোপলেস!

এসব কোন খবর বিজয়ের দুনিয়ায় পৌঁছয় না। সোমের বাগানে রঙীন ছাতার তলে বসে সাদা খরগোসকে কাজুবাদাম খাওয়ায় বিজয়। পিকপিককে বলে—

—মধ্যবিত্ত এই সংসারগুলোর আশা-আকাঙ্খার পরিধি যে কি ছোট, তা তুমি ভাবতে পারবে না। মনে হয়, যে কোন কীট-পতঙ্গের সঙ্গেই তুলনীয় এদের আকুতি। যেমন, ভেবে দেখ, ওরা হয়তো আশা করে, আমি চাকরি করবো। চাকরি করে ওদের খাওয়াবো। আমি দশটা পাঁচটা আফিস করছি ভাবতে পারো?

পিকপিক সোমের টানাটানা চোখ যেন মূর্ছা যায় একথা শুনে। এলিয়ে পড়ে তার চোখ। বিজয় বলে—সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি জানো? কেউ আমাকে বোঝে না। একেবারে একটা উদাসীন নির্লিপ্ত পরিবেশের মধ্যে থাকবার যে কি দুঃখ, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না আমি।

—ভেব না ওসব কথা, বিজয়। তোমার বই-এর কথা ভাব।

যখন যাকে ছেড়ে দেয় পিকপিক সোম, ছাড়বার প্রাকমুহূর্তে তার প্রতি সে বেশী দরদী হয়ে ওঠে। বিজয় তা জানে না।

'সিলেক্ট' ক্লাব শেষ অবধি টাকা তুলেই ছাপায় বিজয় দাশের নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর ওপর সেই দুরূহ গবেষণার বই। দেখা যায়,

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংকট ও তার সমাধানের ভাবনা এক 'সিলেক্ট' ক্লাবই ভাবে। এরা ছাড়া আর কেউ সে সব বোঝে না। পিকপিকের আদুরে পুতুল বিজয় দাশের হয়ে শানু স্তেইন্ আর বুবলু্ গাঙ্গুলীরা বিলিতী পাবলিশারকে মিছেই অনুরোধ করে অপমানিত হয়। অক্সফোর্ড বা ম্যাকমিলান কিছুতেই বুঝতে চায় না এই ধরনের বই ছাপাবার গুরুত্ব।

পিকপিক যে বিজয়কেও গ্র্যাণ্ড এক্‌জিট দেখিয়ে দেবে বলে এমন নাটকীয় আয়োজন করেছে, বিজয় তা বোঝে না। পিকপিকের চেষ্টায় বুবলু্ গাঙ্গুলী জোগাড় করে দেন কাগজ। স্তেইনদের প্রেসে ছাপা হয় বই। বুলা রায়ের বন্ধু এক ইংরেজ ভদ্রলোক করেন লে-আউট।

বই বেরুলে গাড়ি করে পিকপিক সোম বই বিলিয়ে বেড়ান খবরের কাগজের অফিসে। 'সিলেক্ট' ক্লাবের মানুষেরা বোঝেন এবার এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের মূর্খ মানুষগুলো অবহিত হবে। দেশবাসীর হৃদয়মনের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঢেলে দেবে বিজয় দাশ-এর পায়ে।

কার্যকালে তা হয় না। খুব যত্ন করেই ছোঁড়া হয়েছিল গুলি— কিন্তু কেমন করে যেন টিপ ফস্কে যায়। সমালোচনার ভার পড়েছিল বিজ্ঞানীদের হাতে। তাঁরা কলম শানিয়ে কড়া ভাষায় লেখেন— 'সংস্কৃতি জগতে মহাসঙ্কট উপস্থিত। গল্প-উপন্যাসের জগতেও এমন কাণ্ড দেখা যায়নি। বিজ্ঞান নিয়ে উদ্ভট উপন্যাস যদি লিখতেন লেখক—তবু পাঠক তাঁকে ক্ষমা করতো কি না, সন্দেহ আছে। দেখা যাচ্ছে ফিজিক্স সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও যাঁর নেই, তিনি ব্রতী হয়েছেন আইনস্টাইনের অলিখিত অধ্যায় লিখতে। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা এই রকম স্বৈরাচার দেখিনি। এদেশে কি সবই সম্ভব হয়? সত্য বিজয় দাশ, কি বিচিত্র এই দেশ!…'

স্তাবকরা কিন্তু সমালোচকদের কথা উড়িয়ে দিল। সেই কাঁচের ঘরে তারা বিজয়কে অভিনন্দন জানালো এক বিরাট পার্টিতে। মিসেস

স্তেইনের সেই সুবিখ্যাত চেকোশ্লোভাকিয়ার কাঁচের গামলায় আসল স্কচ্ ঢেলে রুপোর ডাণ্ডিওয়ালা ছোট ছোট মগ রাখা হলো। সে পার্টিতে যা খরচ হলো, তাতে বিজয়কে বসিয়ে ওরকম বই আরো পাঁচখানা লেখানো চলতো।

উপন্যাসের শেষে এক সকরুণ উপসংহার। সেই বই পাঁচশ' কপিই পিকপিক সোমের কেতাদুরস্ত ড্রাইভার এসে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায় বিজয়ের বাড়িতে। সঙ্গে দিয়ে যায় মুখ-আঁটা নীল খাম। পিকপিক লেখে—মনটা ভালো নেই তার। ডি. ভি. সি. চললো বুবলু গাঙ্গুলীর সঙ্গে। বিজয় যেন ব্যস্ত না হয়। সে-ই সময়-সুবিধে মত দেখা করবে তার সঙ্গে।

হেরে গিয়েছে বলেই হার স্বীকার করে না বিজয়। পিকপিক সোমের পরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে বুলা রায়।

বড় দুঃখ ভালবাসে বুলা রায়। ছোটবেলা বুলা দুঃখ ভালবাসতো এত যে সবতাতেই তার দুঃখ হতো। বাড়িতে মুরগী কাটা হবে জেনে মুরগী দেখলেই তার কান্না পেত। রিকশাওয়ালাদের দেখে কষ্ট হয় বলে একবার একজনকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বিপদে ফেলেছিল।

ক্লাসে টমকাকার কুটির পড়ে ইভাঞ্জেলিনের মৃত্যুর দুঃখে সে তিনদিন ধরে কেঁদেছিলো, আর সেই ছবি দেখে—চুল ঝুলিয়ে গোলাপ ফুল হাতে ছাতে বসে আকাশের দিকে চেয়ে নিজেকে ইভাঞ্জেলিন মনে করতে চেয়েছিল।

একদা এক দরিদ্র সহপাঠিনীকে বলেছিল—তুমি ত' ভাই ফ্রি স্টুডেণ্ট! তুমি ত' গরীব! নিয়ে যাবে আমাকে তোমাদের কুঁড়েঘরে?

তার সহপাঠিনী সে কথা শুনে খুশী হতে পারেনি। তার মনে হয়েছিল বুলা তাকে যেচে অপমান করেছে।

একদিন ইস্কুলে সে রচনা লিখেছিল 'দারিদ্র্য' সম্পর্কে। লিখেছিল—'আমরা বড় গরীব। আমাদের ড্রাইভার, মালী, বাবুর্চি সবাই গরীব। আমার বাবার কুকুর আর আমার গভর্নেস—সবাই আমরা গরীব!'

সে রচনা পড়ে উঁচু খোঁপা বাঁধা বাংলা দিদিমণি লিখেছিলেন—'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা। কোন কাজ না থাকিলে এইসব উদ্ভট চিন্তা আসে। আর কিছু করিবার না পাইলে মোজা বা মাফলার বুনিবে।'

কিন্তু যে ট্রাজেডি ভালবাসে, তাকে নিরস্ত করা কি বাংলা দিদিমণির কাজ? বুলা রুক্ষ চুলে এলোখোঁপা বাঁধত, প্রেম করতো বেছে বেছে খোঁড়া প্রফেসর, কুশ্রী সহপাঠি বা বুড়ো টিউটরের সঙ্গে। তাদের হাত ধরে বসে থাকত ছলছল চোখে, বা টাকা ধার দিতো যখন-তখন। ভাঙা ঘরে, ময়লা বিছানায় গরীব কোন কেরানীর ঘর করছে সে, এই ভাবলে তার শরীরে রোমাঞ্চ হতো। বিয়ের কথা হতে সে বাবাকে জানিয়েছিল—আমি ভীষণ গরীব কাউকে বিয়ে করতে চাই।

হায়, স্বপ্নের সৌধ বুঝি এমনি করেই ভাঙে। অজয় রায় তাকে তার উদ্ভট সাধ নিয়ে ঠাট্টাই করলো চিরদিন। কিন্তু দারিদ্র্য দিতে পারলো না। মাসে তার পাঁচ হাজার টাকা রোজগার মাইনে আর শেয়ারের ডিভিডেণ্ড থেকে। গাড়ি বাড়ি রেফ্রিজারেটার, অনুগত সুদর্শন স্বামী, সুস্থ সুন্দর দুটি সন্তান—বুলার আর দুঃখী হওয়া হল না।

এখন অনেকদিন বাদে, বিজয়ের বইয়ের ব্যাপার দেখে, পিকপিকের রূঢ় ব্যবহার দেখে বুলার মনে হলো, মনের মত একটি দুঃখের দোসর পাওয়া গেল এতদিনে। বিজয়কে সে বললো—আমি বিশ্বাস করি তোমার মধ্যে একটা আগুন আছে। সে আগুনটা একদিন জ্বলে উঠবেই। তুমি নতুন একটা কিছু করো বিজয়।

বলে—তুমি মিউজিক নিয়ে কাজ করো।

অজয় রায় বিলেতে যায় তিনমাসের জন্যে। বুলা তাকে প্লেনে তুলে দিয়ে বিজয়ের কাঁধে মাথা রেখেই কাঁদে। বাড়ি ফিরে বিজয়কে নিয়ে যায় ওপরে। ডোডোকে আয়ার কাছে রেখে তারা দু'জন শুধু দুঃখের কথা বলা-কওয়া করে। বুলার যে কতরকম দুঃখ—শুনে শুনে আশ্চর্য হয় বিজয়।

বুলার যখন বিয়ে হয়েছিল, বুলা যখন সিয়ামিজ বেতের একটা সেট কিনতে চেয়েছিলো তার স্টাডির জন্যে। কিন্তু অজয় রায় সে

কথা না বুঝে মলক্কা বেতের আসবাব কিনে আনলো—এই দুঃখ সে আজও ভুলতে পারেনি।

গঙ্গার ধারে ব্যারাকপুরে একটা মাটির ঘর তুলতে চেয়েছিল সে। তার চালে থাকবে লাউয়ের লতা। উঠোনে বাঁধা থাকবে একটি কালো গাই। একজন সাঁওতালী মেয়ে মাথায় পিয়ালফুল গুঁজে সেই বাড়িটির পরিচর্যা করবে। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'-র একটা কবিতা পড়ে তার মাথায় আইডিয়া এসেছিলো।

অজয় তা না বুঝে একটা বাংলো কিনে বসলো। সেটা আবার ভাড়া দিল চটকলের এক বড় সাহেবকে।

সে দুঃখ বুলা আজও ভোলেনি।

বিজয়ের কাছে বুলা শোনে—বিজয়ের পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, সংসার যে কতখানি নির্বোধ সেই কথা। বিজয় এমন চমৎকার বলতে পারে যে, শুনতে শুনতে বুলার মনে হয়, এত পুঞ্জীভূত দুঃখের কথা সে কোনদিনই শোনেনি। কি দুঃখ, কি ট্র্যাজেডি—বুলা বারবার বলে। ট্র্যাজেডি ও দুঃখ সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান নেই তার। তবু দুঃখপ্রেমী বুলা রায়ের মনে হয়, কবি যেমন বলেছেন—'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেম তৃষা—' তেমনই বুলা রায়ের যত দুঃখ আস্বাদ করবার ইচ্ছে ছিলো, অথচ নিষ্ঠুর ভাগ্য তাকে যা থেকে বঞ্চিত করেছে, সেইসব দুঃখ সে বিজয়কে ভালোবেসে বিজয়ের প্রেমের মধ্যেই পাবে।

বুলা রায় তাই বিজয়কে জড়িয়ে জড়িয়ে ভালোবাসে। আয়ার কাছে রাখে ডোডো আর লুলুকে। নিজে দোতলার ঘরে বিজয়ের বাহুবন্ধনে বসে বসে খালি দুঃখের কথা বলে। সে আর বিজয়, অজয় রায়ের দামী গাড়িতে কলকাতা ঘুরে ঘুরে দুঃখের রসদ খোঁজে। সুইনবার্নের কবিতা পড়ে। বিজয়কে বলে—লেখো, লেখো, মিউজিক নিয়ে লেখো। কে জানে বিজয়, কতদিন বাঁচব আমরা!

বুলার রেডিওগ্রামে করুণ সব সঙ্গীতের মূর্ছনা বাজে। বিজয় আর বুলা হাত-ধরাধরি করে সোফায় বসে সে সঙ্গীত শোনে।

অরুণ ইদানীং বিজয়ের বাড়ি যাচ্ছিলো। বেলার বিয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে। সেদিন ওপরের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে সে বুঝল—বিজয় বাড়িতে আছে।

নীচে মাসীমাকে দেখেনি। তাই ওপরে যাচ্ছিল অরুণ। পা টিপে টিপে। বেলা ডাকলো তাকে—অরুণদা, একটা কথা শুনুন!

অরুণ দাঁড়িয়ে পড়ে। বেলার বিয়ের শেষ সম্বন্ধটাও ভেঙে গেল টাকাপয়সার জন্য। বেলা সেটা জানে। অনূঢ়া এক মেয়ে, বিয়ের জন্যে যে হয়তো বা অরুণেরই মুখের দিকে চেয়ে আছে—তার সামনে দাঁড়াতে তার সঙ্কোচ হয়। বেলা কাছে আসে। বারান্দায় বাতি নেই। তবু ঘরের আলোয় বেলার মুখ-চোখ যেন স্পষ্ট দেখা যায়। সকরুণ মিনতি-ভরা দুটি চোখ—সুশ্রী একটি দুঃখী মেয়ের মুখ। বেলা বলে—আমার বিয়ের জন্যে আপনি আর কষ্ট করবেন না অরুণদা। আপনারা মিছেই কষ্ট করছেন—আমার বড় খারাপ লাগে।

অরুণ কিছু বলবার আগে চলে যায় বেলা। অরুণ উঠে যায় ওপরে। দেখে বিজয় বসে সঙ্গীতের ওপর একটা মোটা ইংরেজী বই পড়ছে। অরুণকে দেখে বিজয় যেন অস্থির হয়ে উঠলো। চোখদুটো অস্থির, হাতের আঙুলগুলো অশান্ত—কেমন যেন লাগলো বিজয়কে। অরুণই কথা বলে—বিজয়, এ সময় তুই বাড়িতে?

—পড়ছি।

—কি রে?

চারিপাশে শুধু মিউজিকের ওপর নানান রকম বই ছড়ানো। বিজয় বলে—চাইকোভস্কি শুনবি?

টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দেয় বিজয়। বেহালায় বাজে সুর। অরুণ বলে—তুই বাজনা শুনছিস? আশ্চর্য তো!

—আশ্চর্য কেন?

—কোনদিনও দেখিনি কি না!

—বা, মিউজিক নিয়ে বই লিখছি না!

—মিউজিক নিয়ে?

—ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি নিয়ে।

—বিজয়, গান-বাজনা কোনদিনও তোর সাবজেক্ট ছিল না। ও নিয়ে ছেলেখেলা করিস না।

—গলায় গান গাইবার কথা কে বলছে? তানপুরা ধরে মেয়েদের মন ভোলাবার মত গান গাইবার উচ্চাশা আমার কোনদিনও নেই। আমি বলছি গানের উৎপত্তির কথা। আর্য-অনার্য সভ্যতার মিশ্রণ আর আরব পারস্যর প্রভাব—আমার মনে হয় সেদিক থেকে তেমন কাজ হয়নি।

—বিজয়, আমাদের দেশে সংস্কৃত-হিন্দী-বাংলা-মারাঠিতে এ বিষয়ে কম করে পাঁচশো বই আছে। আর পশ্চিমের বহু পণ্ডিত এ নিয়ে কাজ করেছেন।

বিজয়ের হাতটা অমনই অস্থির হয়ে ওঠে। মাথার চুলে সে আঙুল চালাতে থাকে। বলে—অন্যেরা কে কি করেছেন, তা জানতে চাই না। আমি যা করবো, তার দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে নতুন।

অরুণ আস্তে 'করে বলে—কিন্তু কে কি করেছেন, সে পুরনো কথা না জানলে তুমি নতুন কথা কেমন করে লিখবে বিজয়?

—লিখবো আমি। দেখিয়ে যাবো তোমাদের। ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্কলারশিপটা যদি পাই, তো চলে যাব বিলেত। পড়াশুনা করবার সুবিধে ওদের দেশে যেমন—আমাদের দেশে তেমন কি?

আর কথা বলে না অরুণ। উঠে আসে। নেমে আসছে যখন রান্নাঘরের দিকে একবার তাকায়। মাসীমা আছে কি না দেখে। দেখে বসে আছে বেলা। উনোনে যেন কি ফুটছে, সেদিকেই চেয়ে আছে। গালে চোখের জল শুকিয়ে আছে। একটু দাঁড়িয়ে দেখল

অরুণ। তারপর একটু দেখতে গিয়ে কখন যে সে দাঁড়িয়ে গেছে, অরুণ আমাকে বলে—সে খেয়াল তার মোটেই ছিল না।

সে শুধু চেয়েই রইলো। বেলা উনুনের দিকে চেয়ে আছে। চোখের জল আবার বুঝি নামলো গাল বেয়ে। বেলা চোখ মুছলো। তারপর হাত ধুয়ে রান্নাটা দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

অরুণ আস্তে করে বেরিয়ে গেল।

সেই রাতেই অরুণ এলো আমার বাড়ি। বললো—রাতে আমি তোর কাছে থাকব বাদল।

অরুণ যখন কিছু বলতে চায়—এমনি করে আসে আমার কাছে। সে রাতে অরুণ বসে রইল। সিগারেট ধরাচ্ছে—আঙুলে পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট। দুটো একটা টান দিচ্ছে কখনো। হেলান দিয়ে বসে আছে ইজিচেয়ারে।

এমনি করে রাত যখন অনেক হলো, রাতের হিসেব যখন হারিয়ে গেল নিঝুম শহরের বাড়িগুলোর ভুতুড়ে আবছায়ায়, তখন অরুণ বলল—বাদল, তোকে একটা কাজ করতে হবে। কাল আমার সঙ্গে যেতে হবে বিজয়ের বাড়ি।

—কেন অরুণ ?

—মাসীমাকে আমি বলবার চেয়ে তুই বললেই ভালো হয়। বেলাকে বিয়ে করবো আমি।

—বেলাকে ?

—হ্যাঁ, বাদল।

অনেক কথা বলতে পারে না অরুণ। আরো কিছুক্ষণ বাদে বলে—আমি ওকে সুখী করতেই চেষ্টা করবো।

এই আমার বন্ধু অরুণ মজুমদার। জীবনে অনেক ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে দেখলাম, অনেক প্রতিভা দেখলাম। কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্বের চেয়ে এইরকম সাধারণ হওয়া যে কতবড় কথা—সে যেন আমি অরুণকে দেখেই শিখেছি। ঐ তার স্বভাব। যখন যা করতে

হবে, আস্তে চুপচাপ—নিজেকে এতটুকু প্রচার না করে সে-কাজ করতে পারে।

অরুণকে আমি ধন্যবাদ দিলাম বারবার। বেলা আমার বোন নয়—কিন্তু বিজয়ের বোন বেলার প্রতি আমারও যেন দায়িত্ব ছিলো। কাপুরুষ আমি। সে দায় স্বীকার করতে পারিনি। অরুণ আমাদের সকলের হয়ে এ কাজ করছে—সে বেশি কথা বলেনি—কিন্তু আমি সেন্টিমেণ্টাল হয়ে গেলাম। আমার সে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা যেন ভাষা খুঁজে পেল না।

বেলার দাদা হিসাবে, বিজয়ের কাছেই প্রস্তাবটা নিয়ে গিয়েছিলাম আমি আর দিলীপ।

বিজয় কিন্তু খুসী হয়ে উঠেছিলো। টাকাপয়সা জোগাড় করা বা অন্যান্য সাহায্য তাকে দিয়ে তেমন হয়নি। তবে সে একগোছা রেকর্ড কিনে এনেছিলো অনেক টাকা দিয়ে।

বরক'নের সম্মান বাইরে, কোন হোটেলে একটা রিসেপশান দেবার ইচ্ছেও তার ছিল। শেষ অবধি তা আর হয়নি।

তবে বিজয়ের কথা মনে করতে বসে আজ মনে পড়ে, বিয়ের রাতে বিজয় সত্যিই খুসী হয়েছিল। খানিকটা যেন কৃতজ্ঞও হয়েছিল অরুণের প্রতি। আর, সেইদিন, অনেকদিন বাদে, আমরা বিজয়কে আমাদের সেই পুরনো দিনের বিজয়ের মতো করে পেয়েছিলাম। এমন কি, বিজয় এমন ঠাট্টাও করেছিল—

—অরুণ শেষ অবধি শালা বলে ডাকবার সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললে ? কে জানতো তোমার মনে এই ছিল ?

অরুণ অল্প অল্প হাসছিলো, আর তারপরেই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। আমাকে সে একান্তে বলেছিলো—বাদল, আমার হাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কি রকম দায়িত্ব নিচ্ছি, বাদল, আমি ওকে সুখী করতে পারব ত' ?

আমি বলেছিলাম—নিশ্চয়।

আর দিলীপ কথাটা চুরি করে শুনে চেঁচিয়ে উঠেছিল—

—আগে ভাবিস নি কেন? এখন দেরী হয়ে গেছে!

অরুণের সঙ্গে বেলার বিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতায় একটা শুভ কাজ। প্রণব, দিলীপ—সবাই এসে দাঁড়ালো। আমরাই কেনাকাটা করলাম। আমরাই বরের হয়ে বর আনলাম, আর ক'নের হয়ে পিঁড়ি ধরে সাতপাক ঘোরালাম। তপন তার চ্যালাদের এনে ভার নিলো খাওয়া-দাওয়ার। বিজয়ের মা, বা বেলার মনে যাতে এতটুকু আঘাত না লাগে, যাতে কখনো মনে না হয়, এ একটা দয়ার কাজ—সে জন্যে অরুণের কি সতর্কতা। সে বারবার বললো—আমি বেলার যোগ্য নই মাসীমা, তবু আমি তাকে সুখী করতে চেষ্টা করবো।

এমন সুন্দর বিয়েও আর দেখব না আমি। আয়োজনে আড়ম্বর নেই—সামর্থ্যের কথা এখানে তুচ্ছ। সত্যি হলো শুধু পাত্র আর পাত্রী। বেলার দিক থেকে সে যৌতুক আনলো তার হৃদয়মনের কৃতজ্ঞতা—এই মানুষটিকে সুখী করবার প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা। আর অরুণ মাধবীকে যা দিয়েছিলো, তার সেই যৌবনের প্রেম, প্রথম উন্মেষের পরাগরাঙা কুসুম—তার কথা অরুণ আর মনেও রাখল না। বেলাকে সে সাদরে সসম্ভ্রমে নিয়ে এল নিজের ঘরে। দুজনেই জীবনে ব্যথা পেয়েছে—দুজনেই চিনেছে জীবনটা কি—সব জেনেশুনে সুখী হতে আর সুখী করতে ব্রতী হলো তারা।

'আমার হৃদয় তোমার হোক'—এ মন্ত্র এমন যোগ্য কণ্ঠে আর কখনো উচ্চারিত হতে শুনিনি।

সাত

বুলা রায়ের সে ট্রাজেডি আস্বাদনের সাধ, আর বিজয়ের সঙ্গীত-রিসার্চের পরিসমাপ্তি ঘটলো একই সময়ে। একটা ছেড়ে আর একটা না ধরলে বিজয় বাঁচবে না। গান ছেড়ে সাহিত্যের বুড়ি ছুঁয়ে বিজয় ছবি আঁকতে শুরু করলো কবে জানি না। শুনলাম যে বিজয় ছবি আঁকছে আজকাল।

তারপর দিন কেটে যাচ্ছে—আমরা চাকরি নিয়ে বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে পড়েছি। কে কার খোঁজ রাখে? বিজয়ের কথাই শুধু শুনি মাঝে মাঝে। তবে যেমন করে শুনতে চেয়েছিলাম তেমন করে শুনি না।

তার নাম যেন কেমন করে অনেকজনের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। কেন এমন হলো তা আর জানতে ইচ্ছা হলো না। শুনলাম বিজয় না কি লাহার দোকান থেকে রং-তুলি কেনে। আর্টিস্ট্রি হাউস ভাড়া নিয়ে একজিবিশন করবার কথাও সে ভাবছে। শুনি যে, আজকাল সে পার্ক স্ট্রীটের চীনে দোকান বা গড়িয়াহাটার কোয়ালিটিতে বসছে পার্বতী মুখার্জি আর সৌরীন সেনদের আড্ডায়। চলতি কথায় একেই বলে—শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশা।

এমনি সময়ে একদিন প্রতীপ দত্তর সঙ্গে দেখা। প্রতীপ দত্ত মস্ত একটা পাবলিসিটি ফার্মে ডিরেক্টর হয়েছে।

প্রতীপ দত্ত আমার সঙ্গে দেখা হতেই আঁকড়ে ধরে। বলে—আপনাদের সেই জিনিয়াস বিজয় দাশকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছি। বিজয় দাশের মা—সম্পর্কে আমার পিসীমা হন। আরো কি জানেন, ওঁরা হাজার হলেও গুরুজন। একটা অনুরোধ করলে ঠিক উপেক্ষা করতে পারি না। কতবার যে এসেছেন আমার বাড়ি

—আর অনুরোধ করেছেন একটা চাকরি করে দিতে বিজয়কে। তাঁর অনুরোধটা মনে ছিলো—আর বিব্‌লি অর্থাৎ অঞ্জনাও বললো —ওকে দিলাম একটা অ্যাকাউন্ট এক্‌জিকিউটিভ-এর কাজ। ভালো কাজ। জানেন না তো, এই সব কাজের জন্যে কি আন্দাজ কিউ পড়ে বড় বড় নামের?

জানি না। স্বীকার করতেই হয় অজ্ঞতা। প্রতীপ দত্ত বলে—তা সে দুদিন এলো। আজ সাতদিন আসছে না। লিখে পাঠিয়েছে —কাজ করতে দিতে হবে ওকে নিজের শর্ত মত—আর আমার ডানহাত চন্দ্রস্বামী যে ওকে ডেকে পাঠাবে—তা চলবে না। চন্দ্রস্বামীকে কথা কইতে হবে ওর টেবিলে এসে। কি ভাবে নিজেকে, বলতে পারেন? চন্দ্রস্বামী পায় পনের শ'—আর ও হলো তিনশো টাকা মাইনের লোক! চন্দ্রস্বামীর অভিজ্ঞতা কত! সে-সব ভাবে কখনো? সম্মান চায়! আরে চায় তো সকলেই! ঐ যে গভর্নমেণ্টের বেয়ারাগুলো—ওরাও কি চ্যাঁচাচ্ছে না যে, ওদেরও গভর্নমেণ্ট সারভেণ্ট বলতে হবে? আসলে কি জানেন? এসব বোগাস! এদের কোন এলেম নেই।

একটা অক্ষম রাগ হলো প্রতীপ দত্তর ওপর। ওর মোটা চৌকো মুখখানা দেখে রাগ হল এই ভেবে যে, বিজয় যাই হোক, ও তাকে সমালোচনা করবার কে? আর বিজয়ের ওপরে রাগ হলো। কেন হল, কি আর বলি?

প্রথমদিকে সময় পাইনি। শেষ অবধি যাওয়া স্থির করলাম একদিন।

বিজয়ের খবরাখবর পেতাম অরুণের কাছ থেকে। অরুণ সম্প্রতি দিল্লীতে আকাদেমিতে একটা কাজ পেয়েছে। সে-ও চলে গিয়েছে।

বিজয়ের মা-র কথা ভেবে দুঃখ হয়। তবু বেলা ছিল, তাঁর কাছে এসে বসতো, থাকতো মাঝে মাঝে।

বেলা না থাকায় তিনি নিশ্চয় খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন।

সময় করে চলে গেলাম একদিন।

বিজয়ের বাড়ির চেহারা আরো মলিন। নোনা ধরে গিয়েছে দেওয়ালে। খুলে আসছে উঠোনের টালি। নীচের ঘরে গোপালবাবুর ছবিখানা উই লেগে কেটে-কুটে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ম্যাপের মত হয়ে ফ্রেমের ভেতরে ঝুলছে।

সুজয় আর কুমুদকে বাড়িতে দেখলাম না। তারা দুইভাই কেমন করে যেন গোপালবাবুর মত সংসার চালাবার কায়দা শিখে ফেলেছে। দুজনেই টিউশনী করে। অফিসে যায়। মুখ বুজে বাজার টানে। গোপালবাবুর মত তাদেরও পার্কে বসবার ইচ্ছে হয় না কি! তা আর জানতে পারিনি।

তবে কেমন যেন মনে হলো—সকালে টিউশানী, দুপুরে আপিস, আর রাতে টিউশানী করতে করতে, সুজয় আর কুমুদেরও হয়তো একদিন আর সোজা বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে হবে না। পার্কে বসে থাকতে সাধ যাবে। অন্ধকারের ঠাণ্ডা স্বাদটা নিয়ে নিজেকে এলিয়ে দিতে চাইবে। কেমন যেন মনে হলো, গোপালবাবুর মত হয়ে যাচ্ছে ওরা। এই অল্পবয়সেই।

মাসীমা রান্নাঘরে বসে চাল ঝাড়ছেন। বিজয়ের নাম করতে যেন অভিশাপ দিয়ে উঠলেন। বললেন—তার নাম তোমরা আর করো না আমার কাছে। বুঝলে? নাম করো না।

বিজয়ের ঘর দেখে আমি কি করে কথা শুরু করব ভেবে পাই না। ঘরের মেঝে ভরা সিগারেটের টুকরো। চায়ের পেয়ালায় সর পড়েছে। ইজেল পর্দা দিয়ে ঢাকা। অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত ছবি সব দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো আছে। প্লেটে চাপচাপ রঙ। তুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেতে।

বিজয়ের চোখের চাহনি যেন কেমন মনে হলো। একটু যেন অপ্রকৃতিস্থ। সেই চমৎকার চেহারা, কোঁকড়া রুক্ষ চুল, আর

চোয়ালের দৃঢ় ভঙ্গিমা—সবই আছে কিন্তু এইসব ছাপিয়েও যেন কিসের ছায়া পড়েছে বিজয়ের মধ্যে।

স্বভাবটা সেইরকমই আছে। কথায় বার্তায় পুরনো বিজয়কে চিনে নিতে দেরী হয় না। তবে চেহারার কেমন একটা পরিবর্তন দেখলাম। বাইরে একটা ক্লান্ত রূপ ওর সেই পুরনো দিনের আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্যকে কেমন যেন নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।

বিজয় হেলান দিয়ে বসল চোখ বুজে। তারপর গড়গড় করে বলে গেল শুধু নিজের কথা। বলল—ভারতের লোকশিল্পে কঙ্কার এত ছড়াছড়ি কেন, তার ওপর সে যা প্রবন্ধ লিখেছিলো, সেটা খুব প্রশংসা পেয়েছে ফ্রান্সের একটা কাগজে। তার ছবি নিয়ে কে কি বলল, কোন্ ক্রিটিক কি লিখেছেন, কার কথার মূল্য কতখানি—এই সব কথাই সে বলে।

বিজয়ের গলাটা কেমন ভাঙা আর চাপা হয়ে গিয়েছে। হতেই পারে। শুনেছি মাঝে মাঝে প্রচুর মদ খায়।

বিজয়ের কথাগুলো এই বিশৃঙ্খল ঘরখানার মধ্যে কেমন যেন এলোমেলো তাড়া খেয়ে উড়ে বেড়ায়। তারা যেন সব অন্ধ পাখির ঝাঁক। এই ইজেলে, বইয়ে, তানপুরায়, টেপ-রেকর্ডারে কোথাও বসবার ঠাঁই পাচ্ছে না তারা। আমার তাই মনে হয়। সেই সব দিশেহারা কথাগুলো ঝাপটা মেরে মেরে আমাকে বিপর্যস্ত করে। আমি হাঁপিয়ে উঠি। বলি—বন্ধুবান্ধবদের কোন খবর রাখিস বিজয়?

—না।

—প্রণবকে মনে পড়ে?

—হ্যাঁ। কেন?

—লণ্ডনের ডক্টরেট পেল প্রণব। ওর পেপারের খুব প্রশংসা হয়েছে দেখিসনি?

বিজয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আমি বলি—আর কারু খবর না রাখলি, নিজের ভগ্নীপতির খবর ত' রাখিস?

—কার, অরুণের ?

—হ্যাঁ। চাকরি নিয়ে গেল না দিল্লীতে ?

—হ্যাঁ, তা জানি। বলছিলো বটে কুমুদ।

—অরুণের ত' এখন খুব নাম-ডাক। সত্যি, পরিচয় দিতে গর্ব বোধ হয়। ভালো কথা, অনাদি···

—অনাদি আবার কি করলো ?

বিজয়ের গলাটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। হাতের আঙুলগুলো চলাফেরা করতে লাগল বাতাসে অস্থির হয়ে। কিন্তু আমি যেন শুনেও শুনি না। দেখেও দেখি না। বলি—অনাদির কথা না-জানাটা অন্যায় তোমার বিজয়। অনাদি সাউথে যাচ্ছে নতুন একটা আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে। ওর মত অল্পবয়সে, এই রকম একটা কাজ পাওয়া সোজা কথা নয় বিজয়। ওর তিনখানা ছবি দিল্লী থেকে কিনেছে গ্যালারীর জন্যে। কেন, এবার গভর্নমেণ্টের হয়ে ও কি অপূর্ব ক্যালেণ্ডার করেছে দেখিসনি ?

বিজয়ের গলার স্বরটা যেন কেমন হয়ে যায়। আমার মুখের ওপর চোখদুটো তুলে বিজয় বলে—অনাদি ছবি আঁকত, তাই না ?

—এই শোন্। অনাদিকে আমরা একটা রিসেপশন দিচ্ছি। কোথায় জানিস ? তোদের সেই 'সিলেক্ট'-এ। সেই কাঁচঘর—মনে আছে তো ?

—সেখানে ?

—বা, দিলীপ যে ও-বাড়ির রঞ্জনাকে বিয়ে করেছে। আমাদের দিলীপ। দিলীপই ব্যবস্থা করেছে। কেন, অনাদির খবর তুই রাখিস না ?

—না—

—কাগজ পড়িস না ?

—কোন্ শিক্ষিত লোক কাগজ পড়ে বলো ?

আমি হাসি। বিজয় চটে ওঠে। অস্থির থেকে আরো অস্থির

হয়ে ওঠে তার লম্বা সুন্দর আঙুলগুলো। আমি বলি—তুমি যাই বলো বিজয়, আমাদের মধ্যে তুমিই ছিলে সবচেয়ে গুণী। অনাদি, অরুণ, প্রণব, দিলীপ—এদের তুমি কি রকম তাচ্ছিল্য করেছ। দেখ, প্রমাণ হলো ত' ?

—কি প্রমাণ হলো ?

বিজয় চেঁচিয়ে ওঠে।

সোজা হয়ে উঠে বসে বিজয়। কপালের রুক্ষ চুলের গোছাগুলো ঠেলে সরিয়ে দেয়। রাগে ও ক্ষোভে তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে এক অস্বাভাবিক দীপ্তিতে। তার হাত দুটো অস্থির। আঁঙুলগুলো অক্ষম ক্রোধে আঁকড়ে ধরে চেয়ারের হাতল। আঙুলগুলো রক্তশূন্য হয়ে যায়—এত জোরে সে চেপে ধরে হাত। বলে—

—প্রমাণ হলো ? কি বলছ বাদল ?

কিন্তু আমাকে কেন যে একটা নিষ্ঠুর অবুঝ জেদ পেয়ে বসে, আমি ভাবতে পারি না। আমি বলি—প্রমাণ হলো যে, প্রতিভা থাকলেই হয় না—সে প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হয়।

—আজেবাজে বকো না বাদল! কি জান তুমি ? জানো, ইট ইজ এ প্রিভিঁলেজ টু বি বর্ন এ জিনিয়াস, ইট ইজ এ কার্স টু লিভ অ্যামং ফুল্‌স্‌। আমার ট্র্যাজেডি তুমি কি বুঝবে ? যারা মিডিয়োকার, তারা ঐরকম কষ্ট করুক। দেখ, পাথরে কলসি ঘষার দৃষ্টান্ত দেখে ব্যোপদেব হওয়া যায়, ব্যকরণ লেখা যায়—তাতে দান্তে বা শেক্সপীয়র হওয়া যায় না। আমি কেন ঐ দিলীপ, অনাদি, আর ঐ সব চাকরি-লোভী লোকগুলোর মত কষ্ট করতে যাব ?

তখন আমার থামা উচিত। কিন্তু আমি বুঝেও বুঝি না। বুঝতে চাই না। আমি বলি—তুমি একটা কিছু কর বিজয়। প্রতিভার লক্ষণ এই নয় যে, ঘরে বসে বসে কিছু না করে তুমি সকলের ওপরে থাকবে আর তোমাকে বুঝলো না বলে দেশের মানুষকে বলবে বোকা।

—দেশের মানুষ বলতে কে ? তোমরাই তো ? আমি তোমাদের প্রশংসা, তোমাদের স্বীকৃতি চাই না। জিজ্ঞাসা করো প্যারিসের ব্যশ্‌নেঁকে, বা জার্মানীর কার্ল মান্‌কে—তারা জানে বিজয় দাশ কি? কেন, তোমাকে দেখাইনি লণ্ডন হেরাল্ডের সে কাটিং ? গেল কোথায় সেগুলো ?

বিজয় কি পাগল হয়ে গিয়েছে ? কথা কয় আর হাতটা দিয়ে ধাক্কা দেয় কেন সামনে ? যেন ঢেউ সরাচ্ছে চোখমুখ থেকে। এত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে কেন ?

আজ জেনেছি, কিন্তু তখন কি ঘুণাক্ষরেও জেনেছি, ভাবতে পেরেছি, যে বিজয়ের ভেতরে তখনই গোলমাল শুরু হয়েছে ? সে চেঁচিয়ে কথা বলেছে, চোখ দুটো তার লাল হয়ে উঠেছে।

তবু আমি বুঝিনি। বুঝতে পারিনি।

তার দিকে চেয়ে সহসা আমার রাগ জল হয়ে যায়। আমি দুঃখ বোধ করি। মনে হয় বিজয় বড় হতভাগ্য। ক্ষমা চাই আমি, বলি—আমারই ভুল হয়েছে।

আমার রূঢ় আচরণ লজ্জা দেয় আমাকে। সত্যি, এতখানি বাড়ানো উচিত হয়নি আমার। বেরিয়ে আসি আমি।

নীচে এসে থমকে দাঁড়াই সিঁড়িতে। বিজয়ের মা তরকারি কুটছেন আর বকছেন বিড়বিড় করে রান্নাঘরে বসে বসে। কি বলছেন? একটা বিশ্রী কৌতূহল পেয়ে বসে আমাকে। দাঁড়িয়ে কান পাতি আমি। শুনি শাপ-শাপান্ত করছেন নিজের ভাগ্যকে, শাপ দিচ্ছেন বিজয়কে। বলছেন—তার চেয়ে তুই চলে যা না কেন, ভিক্ষাসিক্ষা করে খা—যে করে হোক নিজের পেট চালা! ছোট ছোট ছেলেরা আমার শুকিয়ে মরবে চারবেলা খেটে খেটে, আর তুই বসে বসে তাদের রোজগারের অন্ন খাবি ?

মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে শুধু বলছেন—তুমি মরনি, বেঁচে গিয়েছ। হাতে করে তোমার সংসার জ্বালিয়ে দিল বিজয়। তুমি ভাগ্যবান,

পুণ্য ছিল তোমার—দেখতে হলো না। আমি কি এত পাপ করেছিলাম যে এই টানতে আমায় রেখে গেলে? হায় গো, এ তোমার কেমন বিচার?

বেরিয়ে আসতে আসতে আমার আজ গোপালবাবুর কথা মনে হয়। মনে হয় তাঁর সত্যিই সুকৃতি ছিল। মরে বেঁচে গিয়েছেন। বিজয়ের এই পরিণতি তাঁর দেখতে হয়নি।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। আজও, বিজয়ের কথা বলতে আমার সেদিনকার আচরণের কথা মনে করে দুঃখ হচ্ছে। অনুশোচনা হচ্ছে। বিজয়, জানিনা মৃত্যুর পরে আর এক জগৎ আছে কি না। সেখানে গিয়ে তুমি শান্তি পেয়েছ কি না। ক্ষমা করতে পেরেছ কি না আমায়। আজ মনে পড়ছে তোমার গভীর সুন্দর কণ্ঠের আবৃত্তি।

—'ওইখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হতো কতো
কতো দিন,
হৃদয়েরে খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কতো অপরাধ ;
শান্তি তবু, গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।'

বিজয় তুমি কি শান্তি পেয়েছ? সেই পার্বত্য ঝর্ণার কূলে, সেই শালগাছের ছায়ায়, তোমার সে দেহাতীত মন কি আজও জিজ্ঞাসা নিয়ে নিয়ে ফিরে আসে? না কি তুমি সে পরিবেশের গভীর শান্তি আস্বাদ করে শান্ত হয়েছ, স্থির হয়েছ?

বিজয় কি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছে? এই কথাটুকু জানবার জন্যে আজ আমি অনেক দিতে পারি। তবু কি জানতে পারব?

আট

আমি চলে আসবার পর আমার কথাগুলো নিশ্চয় ভেবেছিল বিজয়। অন্য সকলের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের জীবনের চূড়ান্ত বিফলতা তাকে আতঙ্কিত করেছিলো কি ? কে জানে !

সে কথা আমি কোনদিন জানব না। শুধু ভেবে ভেবে মনে কষ্ট পাব সারাজীবন ধরে।

তারও পরে চলে যায় চারটে বছর। ছবি আঁকবার ক্যানভাস ফালাফালা করে ছুরি দিয়ে কেটে, টেপ-রেকর্ডার, ক্যামেরা, গ্রামোফোন, রেকর্ড, সব বেচে দিয়ে বিজয় থিয়েটারের দিকে ঝুঁকলো। ড্রামার দিকটা এমন অবহেলিত হয়ে আছে, সে কথা আগে ভাবেনি কেন ?

কিন্তু বড় কঠিন হয়ে আসছে দিনকাল। উনিশশো বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ ছিল একটা তরল প্রাণবন্যার সময়। তখন যা যা সম্ভব হয়েছে, এই আটান্ন সাল কাবার করে আর তা সম্ভব হয় না। সে তরল উত্তাপ এবার কঠিন হয়ে জমছে।

বিজয়ের নাট্য আন্দোলনের প্রচেষ্টা তাই পর্যবসিত হলো এক শোচনীয় ব্যর্থতায়। পার্বতী মুখার্জির আলিপুরের হল্ ঘরে একদিন পার্বতীর দাদা শঙ্কর মুখার্জি বিজয়কে নিয়ে কত সম্বর্ধনাই না জানিয়েছে।

পার্বতী এ-যুগের ছেলে। পয়সাটা ভালভাবেই চেনে। বিজয়কে সে বললে—

—এমন একটা নাটক লাগান, যাতে ক্রাইম, রোমান্স, ট্র্যাজেডি সব থাকে। সেইসঙ্গে সর্বহারাদের মুখে কতকগুলো বড় বড় কথা

থাকা চাই। নইলে আবার শুনতে হবে নাটকটা সমাজ-সচেতন হলো না।

বিজয় আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে। তার ইচ্ছা ছিল, যীশুখ্রীষ্ট মৃত্যুর পরে কবর থেকে উঠে এসে নতুন করে মূল্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন রক্তাক্ত শরীরে—এর ওপরে রূপক নাটক লিখবে।

পার্বতী চোখ টিপে বলে—ওসবে কাজ চলবে না। বিলিতি বই পড়ে গল্প নিন—আপনি শুধু ফ্রেমটা করে দিন। নাটকটা আমি টুটু সেনকে দিয়ে লেখাতে চাই।

—টুটু সেন?

—টুটু সেন এলে সঙ্গে সঙ্গে সব কয়টা ব্যারিস্টার আর তাদের বৌ আসবে। বোঝেন না কেন? বড় পিছিয়ে পড়ছেন আপনি।

বিজয় দেখেশুনে নাটকের খাতা ফেলে দিয়ে উঠে এসে বাঁচে।

রাস্তায় এসে কান আর মাথা তার ঝাঁ ঝাঁ করে।

সে পিছিয়ে পড়েছে? যুগটা তবে তাকে ফেলে এগোচ্ছে? এ কেমন অগ্রগতি, যে বিজয় দাশ তার নাগাল পাবে না?

বিভ্রান্ত হয়ে যায় বিজয়। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। সে বোঝে না সময়ের নাড়ি কোন্ তালে স্পন্দিত হচ্ছে।

যে প্রতিভার কোন পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে না, তার পেছনে মানুষ অনির্দিষ্টকাল ধরে স্তুতিবাদ চালাতে চাইল না। তা ছাড়া চল্লিশে পৌঁছিয়েও যে মানুষ আজও এটা ছেড়ে ওটা ঠুকেঠুকে নিজের পন্থা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে, তাকে বোঝা কঠিন। ভালো লাগা আরো কঠিন।

দল বদলায় বিজয়। পার্বতী মুখার্জিরা নয়—আরো ছোকরাদের দলে যায়। কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে বসে যারা আড্ডা দেয়, কবিতা লেখে, তাদেরই টেবিলে বসে। কিন্তু এরা তাকে বিশ্বাস করে না। সে-ও এদের বোঝে না। দুই বিচ্ছিন্ন যুগের মানুষ তারা। দুই দলের

ভাষাও বিভিন্ন। ঠুকরে ঠুকরে শুধু বাড়িই খায় বিজয়—আলোর সন্ধান আর পায় না।

থিয়েটারের ট্রুপ ভেঙ্গে কার যেন টাকা নিয়ে বিজয় এক মাসিক-পত্রিকা খুলে বসলো। বললো—আজকালকার যুগের কাগজগুলোর মত বারোয়ারীর মন ভোলাব না। কাগজ হবে সে যুগের ফোর আর্টস্ বা রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত প্রথম দিকের বিশ্বভারতী কোয়ার্টালির মত। দেখিয়ে দেব দেশটাকে।

ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে আসছে বিজয়। তাই কাগজ যাঁর টাকায় চলছে, সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে বলে—আর কেউ না বুঝুক, আপনি তো বোঝেন! আপনি তো জানেন!

তিনি শুধু মাথা নাড়েন। বলেন—কিছু জানতে চাই না। কাগজে যা হয় লিখুন আপনি, যাদের খুশী লেখা ছাপান। আমি চাই বিজ্ঞাপন। আর একটি মাত্র কথা—কারুক্কে গালাগালি দিতে পারবেন না। বুঝলেন? আমি ব্যবসায়ী মানুষ। পাবলিক আর গভর্নমেণ্ট সকলকে খুশী রাখতে চাই আমি। কাগজে ভুম করে কি লিখে বসবেন, আর মরতে মরবো আমি—তা যেন না হয়!

বিজয় তখন কিছু বলে না। আর যাই হোক—মাসে মাসে টাকাটা তার দরকার। এই রূঢ় সত্যটা সে, বিজয় দাশও অস্বীকার করতে পারে না।

কিন্তু বাজারে বুক ঠুকে কাগজ দাঁড় করাতে গেলে যে সব গুণ প্রয়োজন, বিজয়ের মধ্যে সে সব কোথায়? সে পরমত অসহিষ্ণু। এতটুকু প্রতিবাদ সে সহ্য করতে পারে না। তা ছাড়া মালিকের সঙ্গেই তার ঝগড়া লাগে কথায় কথায়।

সাহিত্যের বাজারে বিজয় দাশ কানা ব্যাপারীর মত ঠকে যায় এমনি করে।

প্রথম এবং সর্বাগ্রগণ্য হবার পাগলামিই তার শত্রু হল। নইলে এত জিনিস হাতড়িয়েছে বিজয় সারা জীবন ধরে—কোন একটাকে

ধরে থাকলে দাঁড়িয়ে যেতো সে জীবনে। ঘষে মেজে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক বা শিল্পী হলে অর্থাগমও হতো নিশ্চয়ই।

কিছুই হলো না। সেই সুন্দর শরীর পাকিয়ে উঠলো। চোখের নীচে পড়লো কালি। বন্ধুবান্ধব তাকে দেখলেই সরে পড়তো। কথায়-বার্তায় সেই দম্ভ, সেই আত্মম্ভরিতা তখনো তার অটুট। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বিজয়ের জীবনের এই সময়টার খবর আমরা সব সময় রাখতে পারিনি। আমাদের মধ্যে এক দিলীপই তবু খবরাখবর রাখতে পারতো, যোগাযোগ করতে পারতো। সে রঞ্জনাকে নিয়ে বিলেতে গিয়েছিল অফিসেরই ট্রেনিং ট্যুরে।

পরে সুজয় আর কুমুদের কাছে শুনেছি এই সময়টার কথা। আমাকে বলতে বলতে কুমুদ বিষণ্ণ মুখে বলেছিলো—

—ক্রেন ক্লাবের সে ব্যাপারটা দাদার মনে যে কি দুঃখ দিয়েছিল, কি রকম লেগেছিল দাদার মনে—তোমাকে বলতে পারব না বাদলদা! আমাকে কিছু বলেনি অবশ্য। কবেই বা বলতো! তবে মুখ দেখে বুঝেছিলাম—মনে খুব লেগেছে দাদার। আর শঙ্করবাবুরা যা করলেন!

ক্রেন ক্লাব। বাইরের চোখে বিচার করলে কিছুই নয় ব্যাপারটা। ক্রেন ক্লাবের অস্তিত্বের কথাই বা ক'জন জানে! আর একটা ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন হওয়া বা না হওয়ার ওপরে যে একটা মানুষ ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়তে পারে সে কথাই বা বললে বিশ্বাস করবে কে?

ক্রেন ক্লাব একদিন পুরানো বালিগঞ্জের এক বাড়িতে বাংলার বিচক্ষণ কয়জন মনীষির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চাশ বছর আগে তাঁরাই ছিলেন প্রগতিবাদী বলে পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে এবং বুদ্ধিজীবি মহলে যখন ভাবাবেগ এবং তরল চিন্তাধারার একটা বন্যা এসেছিলো, তখন সে ভীড়ে তাঁরা গা মেশাননি। গল্প, উপন্যাস বা

কবিতা তাঁদের বৈঠকে ঠাঁই পায়নি। সাহিত্যে ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতেন। ক্রেন ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ছিলো মুষ্টিমেয়। 'ক্রেন কোয়ার্টারলি' নামে তাঁরা একটি ত্রৈমাসিক ইংরেজী কাগজ বের করতেন। এ দেশে পঞ্চাশ কপি বিলোন হতো। বাকি সবই যেতো বিদেশে।

ক্রেন ক্লাবের ঘরে ঢুকতেই দেওয়ালে এক তরুণ ফরাসী শিল্পীর আঁকা উড়ন্ত সারসের ঝাঁকের ছবি চোখে পড়তো। বছরে একবার করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে মিলিত হতেন সদস্যরা। সেদিন সারস আঁকা ডিনার, কফি ও পানপাত্রের সেট বেরুতো। সেই একদিনের অনুষ্ঠানের জন্যে বিলিতী হোটেলের স্টাফ আসতো। দার্জিলিং থেকে ফুল আর কাশ্মীর থেকে ফল আসত। কয়েক হাজার টাকা খরচ হতো। সবই ঐ একটি দিনের জন্য।

সেদিন সেখানে বসে ধূর্জ্জটি চৌধুরী, সুপ্রকাশ সেন এবং মার্গারেট গুপ্ত প্রমুখ চিন্তারথীরা সাহিত্যজগতে ও বাংলার চিন্তাজগতে যে দৈন্য এবং যে সঙ্কট দেখা দেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন —পঞ্চাশ বছর বাদে তার অনেকগুলিই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ক্রেন ক্লাবের সে ঐতিহ্য আজও ভাঙেনি। সভ্য সংখ্যা আরো কমেছে। কাগজটি আর বেরোয় না। তবু বছরে একবার করে আজও বার্ষিক অধিবেশন হয়। এখানে যোগ দেবার মানুষ আজও একান্ত মুষ্টিমেয়।

বিজয় এই ক্রেন ক্লাবের সভ্য ছিলো গত দশ-বছর ধরে। আজও টাকা পয়সা দিয়ে এখানে সভ্য হওয়া যায় না। সারা বছর ধরে, চিন্তা ও মনীষার জগতে মৌলিক কোন অবদান থাকলে তবেই ক্রেন ক্লাব বেছে বেছে আমন্ত্রণ জানায় সেইসব মানুষকে।

বিজয় যখন মেহতার কাগজে ছিল তখন ধূর্জটি চৌধুরীর ছেলে সিদ্ধার্থ চৌধুরী সেখানে যাওয়া আসা করতেন। সদালাপী, ভদ্র

রুচিবান মানুষটি। পিতার বৈদগ্ধ পাননি, তবে হৃদয় মনের ঔদার্য পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। বিজয়কে তাঁর ভালো লেগেছিল। তিনিই তাকে নিয়ে যান ক্রেন ক্লাবে।

সে কি বিজয়ের কাছে কম গৌরবের ছিল ? বাংলাদেশে অনেকে অনেক কথা নিয়ে গর্ব করতে পারে, কিন্তু ক্রেন ক্লাবের ছাড়পত্র পেয়েছে, এ কথা বলতে পারে ক'জন ? মনে পড়ছে এই একদিনের অধিবেশনের জন্য বিজয় লিণ্ডসে স্ট্রীট থেকে ধুতি পাঞ্জাবী কাচিয়ে এনেছে—তাকে যে পেপার পড়তে হবে, সেটা ছাপিয়েছে বিলিতী প্রেস থেকে।

ইদানীং তার আর অনেক জায়গাতেই ডাক পড়তো না। তবু বিজয়ের একটা গর্ব ছিলো। ক্রেন ক্লাবের অধিবেশনে কে কে এসেছিলেন আর কি কি আলোচনা হয়েছিল, কে কি পড়েছিলেন, তার বিবরণ যখন স্টেট্‌সম্যানে বেরুতো, তার মধ্যে তার নামও থাকতো। তার হয়তো মনে হতো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই মনে হতো, আর সে ত' আমাকে বলেছেও কতবার—

—এ ঐ সোনা দত্ত আর পার্বতী মুখার্জির মতো স্নবদের জায়গা নয়। এই হলো একমাত্র জায়গা যেখানে আজও মানুষের যোগ্যতার স্বীকৃতি আছে।

কেন এমন করে ভাবতো বিজয় ? কেন এই একটা জায়গায় সে গেল কি না গেল, তার ওপর তার এতখানি নির্ভর করতো ? কেন এখানে মূল্য পাবার জন্য তার অন্তরের ভেতরে, তার ঐ গর্বিত উন্নত চেহারাটার আড়ালে একটা দুর্বল ভীরু মন এমন করে আকুল হতো ?

সে কেন এমনি করে এইসব জায়গায় প্রত্যাশার নোঙর ফেলে বাঁচতে চাইতো ?

আমি তা কোনদিনও বুঝব না। আমি ত' বিজয় নই। আমাদের মধ্যে একজনই বিজয় ছিল। আর তার মন, তার আশা আকাঙ্ক্ষা

এমন সব বৃত্ত ধরে ধরে ঘুরতো যার গতিবিধি আমি কোনদিনও বুঝব না।

এত সাধারণ হয়ে কি বিজয়ের মনটাকে বোঝা যায়?

ক্রেন ক্লাবের সেক্রেটারী হলেন মার্গারেট গুপ্তর ছেলে নন্দন গুপ্ত। সেই বছরই সেখানে প্রণব আমন্ত্রিত হলো, লণ্ডন ইউনিভার্সিটির সেই পেপারটা পড়বার জন্যে।

বিজয় আমাকে বলেছিলো—

—এতদিনে ক্রেন ক্লাবের ইজ্জৎ নষ্ট হতে বসলো।

কেন বলেছিলো বিজয়? সে কি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পাশাপাশি অর্থনীতির জটিল সমস্যা ঠাঁই পেলো বলে? না প্রণব, যাকে সে কোনদিনও তার সমকক্ষ মনে করেনি, সে সেখানে ছাড়পত্র পেলো বলে?

আমি তা কোনদিনও জানব না। অথচ বিজয়ের মনের সেই সব সময়কার কথাগুলি জানবার জন্য আজ আমার মন বারবার ব্যাকুল হয়। জানতে ইচ্ছা করে, শুনতে ইচ্ছা করে।

এ বছর বার্ষিক অধিবেশনের সময় এগিয়ে এলো। লিণ্ডসে স্ট্রীটে যাবার অবস্থা ছিল না। বেঙ্গল স্টীম লণ্ড্রী থেকেই কেচে এল জামা কাপড়। যুদ্ধোত্তর স্পেনের সাহিত্য নিয়ে বিজয় এবার খুব পরিশ্রম করে তৈরী করলো তার প্রবন্ধ। প্রেসে নগদ দিতে পারেনি—বিল বাকি রেখেই ছাপিয়ে আনলো তার পেপার।

কিন্তু সময় চলে যায়। প্রত্যাশিত সে আমন্ত্রণলিপি এল কোথায়? আশা করতে করতে বিজয়ের এমন অবস্থা হলো, যে অন্ধকার ঘরে টেবিলে সাদা কাগজ পড়ে আছে দেখলেই সে আঁধারে হাত বাড়িয়ে পরিচিত সেই পুরু খস্‌খসে খামখানার স্পর্শ চিনতে চাইলো। নিরাশ হতে হলো।

সুজয় আর কুমুদকে সে পিওন এসেছিল কি না, জিজ্ঞাসা করে করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। অধিবেশনের যখন একদিন বাকি

আছে, তখন বাড়ি ফিরে একজন লোক এসেছিলো চিঠি নিয়ে, এই শুনে মা-কে জিজ্ঞাসা করলো—

—কি রকম দেখতে? কি চিঠি এনেছিল?

মা কিছুই বলতে পারলেন না। আর বিজয় নিজেকে ভুলে, সবকিছু ভুলে, মা-র ওপরই চেঁচিয়ে উঠলো—

—কি করো? সামান্য একটা কথারও জবাব দিতে পারলে না?

মা ছেলের দিকে তাকালেন। বিজয়ের ব্যবহারে দুঃখ পাবার দিন তাঁর চলে গিয়েছে। তবু দুঃখ হলো। কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে বললেন—

—বলেছে, আবার ঘুরে আসবে। সন্ধ্যায়।

বিজয় নিজের ঘরে গিয়ে বসলো। সিগারেট খাচ্ছে, কাগজ ওলটাচ্ছে, অস্থির আঙ্‌লে বইয়ের পাতা উলটে দেখছে। সিগারেট পাকাতে গিয়ে, কাগজের ওপর তামাক ঢালতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছে। তার তখনকার অবস্থা আমি দেখিনি—সুজয় দেখেছে—সে প্রত্যাশার ট্রাজেডি বুঝতে পারি, আর আজ যেন অনুভব করতে পারি—সেদিন সেই নিঃসঙ্গ ঘরে একলা মানুষটি কি ব্যর্থ ক্ষোভ অনুভব করেছে।

সন্ধ্যাবেলা যখন দরজার কড়া নড়লো, আর অপরিচিত এক কণ্ঠে—বিজয়বাবু আছেন?—শোনা গেল, বিজয় ছটফট করে নেমে এল নিচে। পিওনবুকে সই করে চিঠিটা হাতে নিয়ে ভেতরে আসতে আসতে সে যেমন নিজের এই প্রতীক্ষার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি অনুভব করলো, সেই সঙ্গে তার এ-ও মনে হলো, যে খামটা যেন পাতলা আর মামুলী। তার মনে হলো নন্দন গুপ্ত খরচ বাঁচাচ্ছে।

ভেতরে আলোর সামনে, মা যেখানে চাল বাছ্‌ছিলেন—সেখানে দাঁড়িয়ে সে খামটা খুললো। খুলে সে যেন নিজেকে বিশ্বাস করতে পারল না।

তার প্রেসের বিল। আর কিছু নয়! দেখে প্রথমটা বুঝতে

সে কিছুটা সময় নিল। তারপরে সে একবার মা-র দিকে তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে। তারপর খামটা মুচড়ে পকেটে রেখে সে বেরিয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যায় সে বেরিয়ে গিয়ে ফিরেছিল রাত করে। ফিরেছিল মদ খেয়ে।

সুজয় বলে—দাদার মনে এমন আঘাত লেগেছিল, যে সেদিন অনেকদিন বাদে মদ না খেয়ে সে পারেনি। ফিরে এসে দাদা আমাকে বলেছিল, সুজয়, আমার যেন কি রকম লাগছে। তুমি আমাকে ওপরে নিয়ে চল।

মদ খেয়ে ব্যর্থতার জ্বালা ভোলবার চেষ্টা কতজন কতদিন ধরে করবে? এই সময় কি সেই সময় বিজয়? এ চলতো বিশবছর আগে। মদ খেয়ে জীবনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মরে যেতো ব্যর্থকাম মানুষ।

এখন যে নিজেকে ভোলবার, ভোলাবার এই প্রক্রিয়াটাও বাতিল আর পুরনো বিজয়! তা কি তুমি জানতে না? তোমার ভাগ্য কেন তোমাকে শুধু যা বিগত, যাতে মানুষ আর বিশ্বাস করে না, করতেও চায় না, সেইসব কাজ করিয়েছে?

ক্রেন ক্লাবের সে ঘটনার আগে পরেই শঙ্কর মুখার্জি আর কোয়ালিটির আড্ডার সৌরীন সেনের কথা বলা দরকার।

সুজয় বলে—তাতেও দাদার লেগেছিল। মনে হয় তেমন করে লাগেনি। কি জানি বাদলদা, দাদা ত' বেশী কথা কইতো না।

পার্বতী মুখার্জির দাদা শঙ্কর মুখার্জি। ভাইয়ের মতো নাট্য-আন্দোলনের বাতিক তার কোনদিনও ছিল না। তবে শঙ্কর মুখার্জি ছিলো ব্যক্তিত্বের পূজারী। বিজয়ের মধ্যে কি দেখে সে আকৃষ্ট হয়েছিলো বলা কঠিন। তবে—বিজয় দাশ একজনই হয়—এই কথা সে প্রায়ই বলতো।

সে নিজের বাড়িতে মাঝে মাঝেই বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আড্ডা দিতো। সেখানে খাদ্যপানীয়ের নতুন নতুন পরীক্ষা হতো। শঙ্কর

বিজয়কে ডেকে নিয়ে তার স্টীভেডোর ইঞ্জিনীয়র বা ব্যাঙ্কের এজেন্ট বন্ধুদের সামনে সগর্বে দেখাতো। বলতো—

—হতভাগা দেশ, তাই এসব মানুষকে বুঝল না।

বিজয়ের একটা সত্তা বোধহয় সেই স্তুতিবাদে তৃপ্ত হতো। নইলে সেখানে কেন যেত বিজয়, আমি তা আজও বুঝি না। কেননা, মদ, ডিনার এবং ব্রিজ ছাড়া সেখানে আর কিছু চলতো না।

বিজয় ইদানীং আর বার্ষিক চাঁদা দিতে পারেনি। তাই এশিয়াটিক সোসাইটি, সায়েন্স কংগ্রেস, ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স, এইসব জায়গা থেকে তার আর ডাক পড়তো না।

এবার পার্বতীদের দলে নতুন নতুন ছেলেমেয়ে দেখেই হোক বা তারও মনে সংস্কৃতির ক্ষুধা জেগেছে বলেই হোক, কোন কারণে, শঙ্কর মুখার্জি একটা সাংস্কৃতিক বৈঠক আহ্বান করলো।

টাকা যার আছে, তার সংস্কৃতি, বা সাহিত্য, বা রাজনীতি সব কিছুই করবার অধিকার আছে। হঠাৎ, চট করে, শঙ্কর মুখার্জির নামটা, সাংস্কৃতিক জগতের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ছড়িয়ে পড়লো চারিপাশে। নিউ এম্পায়ারে তারা 'শো' দেয়। জার্মান বেহালা-বাদককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাচ নিয়ে ইম্প্রেসারিও হয়ে শঙ্কর দিল্লীতে ঘুরে এলো। সে সপ্তাহে তার নাম ইংরেজী সাপ্তাহিকগুলোতে ছাপা হলো ফলাও করে।

শঙ্কর এখানেও নিয়ে গেছে বিজয়কে। বলেছে—আপনি থাকুন ভেতরে। পলিসিটা কি পথ ধরে চলবে, তাই বোঝার জন্যে আপনাকে প্রয়োজন। আপনি হবেন এই প্রতিষ্ঠানের ব্রেইন।

বিজয়ের তখন বোধহয় নৌকো ভেড়াবার জন্য, প্রতিকূল স্রোত থেকে বাঁচবার জন্য, বড় বন্দর না হোক, ছোট ঘাট দরকার। কিছুই সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

শঙ্করের কথা শুনে সে অগত্যা নতুন করে পড়াশুনা শুরু করলো। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কেমন করে চালানো যায়। কে কি

বলেছেন, বিলেতে আইরিশ ড্রামা মুভমেণ্টের সময়ে লেডি গ্রেগরী আর ইয়েট্‌স কি করেছিলেন, সব পড়ে নিয়ে সে একটা মস্ত প্রবন্ধ লিখল।

কাজের মানুষের কি সব মনে থাকে ? শংকর, তার সে বৈঠকের অধিবেশনে শেষ অবধি বিজয়কে ডাকতেই ভুলে গেল।

তার একটা কারণ বোধ হয় প্রতীপ দত্ত। প্রতীপ দত্তের ফার্মই বিজ্ঞাপন ও প্রচারটা করছে। প্রতীপ এখানে আসছে বিব্‌লিকে নিয়ে। প্রতীপ বিজয়ের নাম শুনে চেঁচিয়ে হেসে শংকরের পিঠ চাপড়ে বললো—

—নতুন করে যখন শুরু করছ, সব কিছুই নতুন করো। ঐ মরাঘোড়া বিজয় দাশকে আর টেন না। দোহাই তোমার!

বিবলি বোস আজও দিনের বেলাটা ঘুমঘুম চোখে থাকে। রাত হলে বেড়ালের মতো জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে সে। তখন সে আনন্দ খোঁজে। আফিমের রসে ভেজানো সিগারেট মুখ থেকে নামিয়ে সে বললো—

—কেন ডার্লিং, বিজয়কে কেন ডাকবে না? একসময় সে কি রকম ইন্‌টারেস্টিং ছিল জানো ?

—এইজন্যে ডাকবনা ডার্লিং, যে সে এখন আর ইন্‌টারেস্টিং নেই —সেইজন্যে !

বিবলির উৎসাহ তৎক্ষণাৎ ঝিমিয়ে গেল। আর এ সব কথার কিছু জেনে, কিছু শুনে—বাকিটা ভেবে নিয়ে বিজয় কি করলো কে জানে! সম্ভবতঃ বাড়িতে, ইজিচেয়ারটায় কপালে হাত চাপা দিয়ে বসে রইলো।

এখন আর বুঝতে ভুল হয় না, যে তখনই বিজয়কে ঘিরে, বিজয়ের পৃথিবীটা বড় তাড়াতাড়ি, বড় নির্মম ভাবে ছোট হয়ে আসছিলো। আর বিজয়, সেই সঙ্কীর্ণতা অনুভব করে একলা ঘরে বসে, বা শহরের পথেঘাটে ঘুরে কতই না ক্ষোভ অনুভব করেছে।

ব্যর্থতার জ্বালায় বিভ্রান্ত হয়ে হয়তো বা ভাবতে চেষ্টা করেছে, বুঝতে চেষ্টা করেছে, এ কি হলো !

একদিন যে সে ভেবেছিলো, তার পৃথিবীটা এই শহরে—এই দেশে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভেবেছিলো পৃথিবী নিত্য নতুন জগতের ছাড়পত্র লিখে দেবে তাকে। বিজয় দাশকে।

তা হলো কোথায় ? সেই সীমাহীন পৃথিবী, সেই তারিয়ে তারিয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, তার ভিত্তি ত' বাস্তবে ছিল না। সে যে বিজয়ের মনোজগতের সৃষ্ট আর এক পৃথিবী।

তবে বাইরে দেখলে তখনো তাকে পুরনো বিজয় দাশই মনে হতো।

বিজয় দাশকে তখনো দেখেছে কলকাতার মানুষ। দেখেছে মাথা উঁচু করে চাদর লুটিয়ে দিয়ে কলেজ স্ট্রীটে হাঁটতে, বিদেশী ছবির একজিবিশনে ডেনমার্কের রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করতে, ইহুদী বেহালাবাদকদের সভাতে দশ টাকার চেয়ারে বসে থাকতে।

তার ভক্তমহল তাকে পরিহার করে নতুন নতুন প্রতিভার সন্ধানে ব্যস্ত। বিদ্বৎসমাজ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে।

ঘর তার কাছে অসহ্য। তবু ঘুরে ফিরে কোথাও ঠাঁই না পেয়ে বিজয় ঘরেই ফিরে আসে। ঘরের তাকে তার লেখা বইগুলো পোকায় কাটে। এই নিঃশব্দ মৃত্যুর মত স্তব্ধ ঘরখানায় পোকার সে কুরকুর শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়। তাই শোনে বিজয় বসে বসে।

তার বহু বছরের পরিশ্রমের ফল ঐ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বই, ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে ইংরেজী বই, তার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকাগুলো—ওগুলোর মধ্যে তার জীবনের আট দশটা বছর কি সে ঢেলে দেয়নি ? বইয়ের পাতা নয়, বিজয়ের মনে হয়, তার জীবনের অনেক উচ্চাশা, অনেক রঙীন স্বপ্ন ওই বিষাক্ত পোকাগুলো কুরিয়ে কুরিয়ে কেটে চলেছে।

একজিবিশান থেকে যে সব ছবি ফেরৎ এসেছিলো, সেগুলি দেওয়ালে ঝুলছে অনাবৃত, ধুলোয় ঢাকা।

যে দিকে তাকাবে বিজয়, সেদিকে কি শুধু ব্যর্থতার ছবিই দেখবে? কোথাও, কোনো জায়গায় সে সার্থক হয়নি? এতটুকু ফসল ফলাতে পারেনি?

বিজয়ের শুধু সেই কথা, সেই চিন্তা মাথায় ঘুরে ঘুরে মরে।

তাকাতে পারে না বিজয় কোনদিকে।

একদিন, যখন এই পরিবেশ তার শ্বাস বন্ধ করে আনছে মনে হলো—বিজয় নেমে এলো দোতালায়। বসলো তার মা-র কাছে। মনে হলো আর কেউ না হোক, মা ত' তার সঙ্গে কথা কইতে পারেন! খানিকটা ভয় পেয়েই গেল মা-র কাছে।

মা চমকে উঠলেন। বললেন—কি হয়েছে? শরীর খারাপ হয়েছে? কিছু হয়েছে?

—না। এমনি এলাম। কি করছো?...

—এমনি এলে? কি করছি?...

বিজয়ের কথাগুলোই নির্বোধের মত আবৃত্তি করে মা চেয়ে রইলেন। বিজয় তাঁর চোখের সে দৃষ্টিতে যেন নিজেকে চিনতে পারলো। কোথায় ছেলে আর কোথায় মা...দু'জনের জগৎ সেই কবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন দুই জনের দুই পৃথিবীর মাঝখানে এক অপরিচয়ের সমুদ্র। কেমন করে আর সেতু বাঁধা সম্ভব?

এ কথা বিজয় বলতে পারল না। সে নিজেকে নিজেই ভয় করতে শুরু করেছে। বসে থাকতে থাকতে মাথায় তার অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া সব চিন্তা আসে। যেমন, একদিন তার মনে হয়েছিলো, ছবিগুলো সে চিনতে পারছে না। ওগুলো উল্টো করে টাঙালে বোধহয় বুঝতে পারবে সে। তাই মনে করে সে ছবিগুলি উল্টে দেয়ালে ঝুলিয়ে দেখছিলো বসে। সুজয় দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে—

—এ কি করছ দাদা?

তখন তার মনে হয় যে, না—সে খুব ছেলেমানুষী একটা খেয়ালপনা করে বসেছে। আবার ছবিগুলো ঠিক করে রাখতে রাখতে এ-ও তার মনে হয়, কিছুক্ষণ আগে যে কাজটাকে মনে হয়েছিলো স্বাভাবিক, এখন আবার মনে হচ্ছে সেটা একটা ক্ষ্যাপামির কাজ হয়েছে—এমন কেন হয়?

কোন কোন সময় তার মনে হয়েছে, সে একলা নেই ঘরে—আর একজন কেউ বসে আছে, আর আশ্চর্য এই, যে সে-ও বিজয় দাশ। তবে কি তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার মনটা অমনি করে বসে আছে?

আশ্চর্য এই, যে বসে আছে, সে এমন চালাক, এমন ধরাছোঁয়ার বাইরে—যে তাকে বিজয় দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছে না, অথচ তার উপস্থিতির কথা সে জানে। বিজয় সে সব সময় বাতি জ্বেলে ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। খুঁজে খুঁজে হঠাৎ যেই বুঝেছে যে কেউ নেই, ঘরটা ফাঁকা—তখনি তার ভয় করেছে।

মনে হয়েছে, একলা বসে থাকতে থাকতে তার এইসব হচ্ছে মনে মনে। নিজের মনটাকে বিশ্বাস করতে না পেরে বিজয়ের তখন অসহায় বোধ হয়েছে। সে তখন কারু না কারু সঙ্গ চেয়েছে। মা, ভাইরা, বা যে কেউ হোক না কেন।

মা-র সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টাগুলো যখন আবার আর একটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, সে তখন ভাইদের কাছে যেতে চেয়েছে। মনে হয়েছে, তারা যদি তার সঙ্গে কথা বলে, তার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটায়, তা হলে হয়তো তার এমন লাগবে না।

কিন্তু তাই কি সম্ভব হয়েছে?

ভাইদের সঙ্গে তো তার কোন সম্বন্ধই নেই। রাত করে ফিরে সুজয় অফিসের পরীক্ষা দেবার বই পড়ে। বিজয় একদিন নেমে এলো। বললো—কি করছিস সুজয়?

—পড়ছি, দাদা!

—কি পড়ছিস, অ্যাকাউন্টস—তোর বুঝি অঙ্ক ভালো লাগে?

—এ আমার পরীক্ষার বই, দাদা!

—কি পরীক্ষা? তুই কি এম. এ. দিবি? তুই তো চাকরি করিস!

—না দাদা। এ আমার অফিসের পরীক্ষার বই।

—এ পরীক্ষা দিলে কি হয় সুজয়?

দাদা এই সাধারণ প্রশ্ন কেন এত আকুতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, বুঝতে পারে না সুজয়। সে বলে—অফিসের এ পরীক্ষায় পাশ করলে আমার মাইনে বেড়ে একশো ষাট হবে।

—ও!

বলে চেয়ে থাকে বিজয়। এখন যদি সুজয় আরো দুটো কথা বলে, তাহলে বিজয় আরো একটু বসতে পারে। সে কথা বুঝতে পারে না সুজয়রা। একটু যেন সন্ত্রস্ত বোধ করে তারা। বিজয় আর কথা না পেয়ে—আচ্ছা, তবে যাই, বলে উঠে পড়ে।

আশ্চর্য হয়ে কুমুদ মা-কে জিজ্ঞাসা করে খাবার সময়ে—

—মা, দাদার কি হয়েছে? দাদার সিগারেট এনে দিয়েছিল তো মোহন? সন্ধ্যেবেলা কফি দিয়েছিল দাদাকে?

—হ্যাঁ! কেন?

—হঠাৎ কেন নীচে এলো দাদা—কেন কথা বলছিল, তাই ভাবছি! এমন তো কোনদিনও আসে না।

এর উত্তরে মা আর ছেলেরা আবার চুপ করে যান। মা এ-কথা বলেন না, যে—কেন, ভাইয়ের সঙ্গে কথা কয় না দাদা?

সে সহজ উত্তর আসে না মা-র মুখে। সহজ সব কিছুকে অসহজ করে ফেলেছে বিজয়।

আবার ওপরে উঠে গিয়ে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় একলা একলা বসে থাকে বিজয়।

সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে চায় না তার পা দুটো। ওপরে

গিয়ে ত' আবার সেই একা একা বসে থাকা। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা, নির্জন ঘর। আর সবচেয়ে শূন্য হলো মন।

এই সময়কার মনের অবস্থার কথা বিজয় তার খাতায় লিখে রেখেছিলো। কিছুই নয়, একটা বিদেশী গল্পের অনুবাদ। এ ধরনের কাজ সে আগে কখনো করেনি। তবে ইদানীং অনুবাদ করে কাগজ থেকে কিছু টাকা পেতো মাসে মাসে। সম্ভবত সেই কারণেই এই গল্পটার অনুবাদে হাত দিয়েছিল সে। গল্পটা এক মৃত্যুদণ্ডের আসামীকে নিয়ে।

জিব্রালটারে পরিত্যক্ত এক মূর দুর্গে বন্দী একলা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। তাকে আর সব বলা হয়েছে, শুধু এই কথা বলা হয়নি কি ভাবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। সে জানতে চেয়েছে বারবার। বিচারক বলেছেন—সে কথা আমরা জানাব না। তবে এ কথা জেনো, যে এক অভিনব উপায়ে মৃত্যু আসবে তোমার কাছে।

সমুদ্রতীরে এক পরিত্যক্ত দুর্গচূড়ার ঘরে সে বন্দী। ঘরখানাতে আটটা জানলা। সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে খাড়াই পাহাড়ের অনেক নিচে সমুদ্র চোখে পড়ে। পালাবার কোন পথ নেই।

তবু সে ঘরে অবারিত আলো আসে, হাওয়া আসে, আকাশ দেখা যায়—ঈগলপাখীরা আরো উঁচুতে পাহাড়ের চূড়ায় তাদের ঘরে ফিরবার সময়ে এই ঘরের জানালার সামনে ডানা ঝাপটে যায়। রাতে দেখা যায় অসংখ্য তারা, মনে হয় তারা যেন বন্দীর সঙ্গী। বন্দী নিঃসঙ্গ নয়।

বন্দী কৃতজ্ঞ বোধ করে। এই অবারিত সৌন্দর্য, এই প্রসন্ন উদারতা, এই আকাশ ও অনন্তে বিলীন সমুদ্রের সবটুকু অবাধে তাকে উপভোগ করতে দিয়েছেন বিচারক। সে যেন ধন্য বোধ করে। এর পরে আর কোন মৃত্যুই তার কাছে ভয়াবহ লাগবে না।

কিন্তু, সাতদিন বাদে, একদিন সকালে উঠে বন্দীর মনে হয়

কোথায় যেন কিসের তাল কেটে গিয়েছে, কি যেন হয়েছে, সে ধরতে পারছে না। বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ দেখে সে—জানলার সংখ্যা আটটা নেই—সাতটা হয়ে গিয়েছে। আর, ঘরটাও সেইসঙ্গে একটু ছোট হয়ে এসেছে পরিসরে।

সেইদিন বন্দী বোঝে, বিচারক তার সঙ্গে কি নির্মম পরিহাস করেছেন। তার হাত পা শৃঙ্খলাবদ্ধ। সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারবে না। আর এখন থেকে তাকে শুধু প্রতীক্ষা করতে হবে—কতক্ষণে, কত আস্তে আস্তে, একটা একটা করে জানলা কমে আসে। ছোট হয়ে আসে তার ঘর। তার জীবন।

আর একটা রাত কাটে। আর একটা জানলা কমে।

তারপর বিজয়ের কথা, নিজের কথা—একটা একটা করে জানলা হারিয়ে যাবে আর পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসবে? বসে বসে হাত মুঠো করে তাই দেখতে হবে? কিচ্ছু করতে পারব না? আমি আর এ গল্প অনুবাদ করতে পারছি না। আমি পারছি না। আমি পারছি না।

শেষের 'পারছি না'-টা মস্ত বড় করে পাতাজুড়ে লেখা।

এই গল্পটা এবং বিজয়ের নিজের মন্তব্য থেকে বিজয়ের মনের তৎকালীন অবস্থাটা বোঝা যাবে।

গল্পটার নায়কের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে বিজয় যে কি রকম ভয় পেয়েছে, তা যদি তখন কেউ জানত! এই থেকেই ত' বোঝা যেত যে বিজয়ের মনটা আর তার বশে থাকছে না!

এই গল্পটা কেন তাকে অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল? প্রশ্ন করতে আশ্চর্য হয়ে কাগজের সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন—ঐ গল্পটা বিজয়বাবু নিজে জেদ করে অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। আমরা বলিনি। আমরা জানতাম না ওরকম কোন গল্প আছে।

নয়

শেষ অবধি ছোট্ট একটা ধাক্কায় ভেঙে গেল বিজয় দাশ।

সেই তপন আর স্বাতীর ব্যাপার। স্বাতীকে কিছুতেই ডিভোর্স দিতে চান না জবরদস্ত পুরনো সিভিলিয়ান জোয়ার্দার সাহেব।

তপনও কম ছেলে নয়। পুরো ন-টি বছর অপেক্ষা করলো তারা। স্বাতী চাকরী করতে লাগলো সেই ইস্কুলেই। তপন তার বন্ধুর সঙ্গে পার্টনার হয়ে খুললো ইলেকট্রিকের সাজ-সরঞ্জামের দোকান। স্বাতীর সেই বাইশ বছরের যৌবন ঝরে গিয়ে একত্রিশ বছর বয়স হলো। তপনের হলো তেত্রিশ।

স্বাতী আর তার মা-র সঙ্গে একটি ফ্ল্যাট নিলো তপন। রাতে থাকে দোকান-ঘরে। দিনমান কাটে স্বাতীর সঙ্গে। একসঙ্গে চা খাওয়া থেকে দিন শুরু। রাতে তপন স্কুটারে ওঠে রাতের খাবার খেয়ে। স্বাতী বলে—অপেক্ষা করে করে কি ক্যালেণ্ডারের সবগুলো তারিখই ফুরিয়ে যাবে?

তপন বলে—তা কখনো হয়? সব ফুরিয়ে গেলেও কিছু থাকবে হাতে। অনেক তারিখ তো চাই না আমি। একটি দিন পেলেই যথেষ্ট মানবো।

শেষ অবধি জোয়ার্দারের সুবুদ্ধি হলো। বর্মাতেই দেহ রাখলেন তিনি।

তপন আর স্বাতীর বিয়ে হলো। বিয়ে হলে বৌ যায় বরের বাড়ি। এ বিয়েতে রেজিস্ট্রেশনের আগের দিন তপন তার বিছানাটা রিকশায় চাপিয়ে দোকান থেকে এই বাড়িতে তুলে আনলো। স্বাতীর ইস্কুলের সহকর্মীরা এসে লুচি-আলুরদম বানালেন। আমরা টেলিগ্রামে শুভেচ্ছা জানালাম।

অরুণ আর তপন মজুমদারদের ভাইয়ে ভাইয়ে দেখলাম মানুষের শুভেচ্ছা পাবার সৌভাগ্য আছে। তপনের পুরনো ক্লাব-লাইব্রেরির ছেলেরা বিনা নেমন্তন্নে এলো হৈ-হৈ করে। তারা খাবার-দাবার আনলো, ফুল আনলো। মোটা মুরারী বিশ্রী গলায় উলু দিল। অন্যরা গ্রামোফোনে সানাই-এর রেকর্ড বাজালো। তপন যেমন তাদের ডাকেনি—তেমনি তারা আসতেও আশ্চর্য হল না। এরকমটা হবেই, এটাই স্বাভাবিক—এই হলো তার ভাব। স্বাতীরও এতদিনে তপন আর তার বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে কম অভিজ্ঞতা হয়নি। সে লাল চেলির শাড়ীর ওপর তোয়ালে জড়িয়ে আরো লুচি ভাজতে গেল।

বেশ কয়দিন তপন আর স্বাতীর বিয়ের কথা সবাই আলোচনা করলো এখানে-সেখানে বসে।

সকলেই খুশী হলো। তপনকে সকলেই ভালোবাসে। আর স্বাতীর সঙ্গে তার সম্পর্কটাও সবাই জানতো। এমন কি তপন দেখে-শুনে বললো—

—আমি বিয়ে করলে তোমরা সবাই এত খুশী হবে জানলে আমি কবে বিয়ে করতাম। যেমন করে হোক।

চায়ের দোকানে বসে বিজয় এসব কথা শুনে স্বভাবসুলভ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—তপনটা চিরদিনই মেয়েপাগলা। নইলে ঐ স্বাতী—স্বাতী মানে ললিতার কি রকম বোন ত'? মেয়েটিও এমন কিছু নয়···

তপনের ছোট ভাই পল্টু বসে চা খাচ্ছিলো। সে রুখে উঠলো —বিজয়দা, এসব কথা বলো না। বড়দাদা তুমি, তবু সহ্য করবো না। জানলে?

বিজয় চোখটা ঘষে তার দিকে তাকাল। সে যখন অরুণের সঙ্গে বি. এ. পড়তো, এই পল্টু ছিলো দশ বছরের ছেলে। ছুটে ছুটে তাদের সিগারেট এনে দিতো। সেই পল্টু এখন তার সঙ্গে এমনি করে কথা বলছে!

নিঃসন্দেহে দুনিয়াটা বদলে যাচ্ছে। সে বলল—পল্টু, তোমার কি এরকম কথা বলা উচিত?

পল্টু বলল—বলতে তো চাই না। তুমিই বলাচ্ছো। তুমি বরঞ্চ বিয়ে কর বিজয়দা, নইলে অ্যাসাইলামে যেতে হবে।

শুধু চেয়ে থাকতে পারল বিজয়। ধাক্কাটা যদিও কথার, তবু মনে হলো যেন কেউ তাকে গলাধাক্কা মেরেছে।

বেরিয়ে এসে বাড়ির পথ ধরতে গিয়ে কখন অজান্তে পার্কে গিয়ে বসলো, তার সে কথা মনে নেই। বেঞ্চিতে বসে বসে অনেক কথাই মনে হলো। মনে পড়লো বয়স তার তেতাল্লিশ হলো।

নেহাৎ বেকার, বাচ্চা ছেলে বা বৃদ্ধ ভিখিরী ছাড়া সকাল এগারোটায় পার্কে কেউ আসে না। ঘাসের ওপর চড়াই পাখি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে জোড়া পায়ে—দেখতে লাগলো বিজয়। একটা সাদা হুলো বেড়াল রেলিং টপকে এসে নামলো মাঠে। তারপর রেলিংয়ের গা ঘেঁষে কেমন চলে গেল বেড়ালটা। এ সব কেন দেখছে বিজয়? এ সব তো সে কোনদিনও চেয়ে দেখেনি। তবে কি সে ঐ বুড়ো ভিখিরীটার মতই বুড়িয়ে গিয়েছে? ঐ যে ভিখিরীটা বসে টিনের মগ থেকে ভাঁড়ে ঢেলে ঢেলে চা খাচ্ছে, বিজয়ও কি ওরই মত ছুটি পেয়ে গিয়েছে সংসার থেকে?

আজ কেন যেন বাবার কথা মনে হয় বিজয়ের! বাবাকে মনে করতে চেষ্টা করে। এই পার্কে বসেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন বাবা। বাবার সে মুখখানা যেন মনে পড়ে না। মনে পড়ে অল্প বয়সের চেহারা। ভোরবেলা তাকে গড়ের মাঠে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছেন বাবা। সেই হাসিখুশি মুখখানাই মনে পড়ে।

বাড়ি ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায়। সারাটা দিন চিবুকের নীচে হাত রেখে ইজিচেয়ারে বসে সময় কাটায় বিজয়। সন্ধ্যার ঝোঁকে যখন উঠতে যাবে, সামনের দেওয়ালে কে যেন লাফিয়ে ওঠে। আতঙ্কিত হয় বিজয়। তারপর দেখে, তারই ছায়াটা। দেখেও

আশ্বস্ত হতে পারে না। তাকে ছাড়িয়ে ছায়াটা অনেক উঁচু, অনেক বড়। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে। তার চেয়ে তার ছায়াটা অনেক জীবন্ত। কেমন করে হলো? আর ঐ ছায়াটা অত লম্বা কেন? সে তো বিজয় দাশ—মাথায় যে পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি—ছায়াটা কেন সাড়ে ছয় ফিট লম্বা হলো?

বিজয়ের এই ছায়াটাকে ধরতে ইচ্ছে করে। দেওয়ালের সামনে গিয়ে সে বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ায়।

ছায়াটা তাকে ঠাট্টা করে উঁচু হয়ে ওঠে।

বিজয়ের ভয় হয়। আকর্ষণও অনুভব করে। সে আবার উঁচু হয়। ছায়াটা আরো উঁচু হয়।

সে তার রক্তমাংসের শরীরটা নিয়ে বুড়ো আঙুলে ভর করে যতই উঁচু হতে চায়, ছায়াটা তাকে ছাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। বিজয়ের মনে হয়, মানুষ বিজয় দাশ কোনদিনও ঐ ছায়াটার নাগাল পাবে না।

আজ আমি মনে করতে পারি বিজয় তার সে ছায়াটাকে ধরবার জন্যে সে কি আকুল চেষ্টা করেছে। দেওয়ালের গায়ে আঁচড়ে আঁচড়ে ছায়াটার মাথা ধরবার চেষ্টা করেছে, আঙুলের চামড়া উঠে রক্ত বেরিয়েছে। আর ছায়াটা আরো উঁচু হয়ে গিয়েছে।

চাকরটা কফি দিতে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে মজা দেখছিলো, তার দিকে চোখ পড়তে তবে বিজয়ের সম্বিৎ ফেরে। সে হাত দুখানা ধুয়ে ফেলে। আঁচড়ের জায়গায় আয়োডিন লাগায়।

ইজিচেয়ারে বসে যখন, তখন শরীরটা থর থর করে কাঁপছে। নিজেকে সামলাতে অনেক সময় নেয় বিজয়। মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে থাকে। ছায়াটাকে আর দেখে না।

চাকরটা সে কথা নিচে গিয়ে বলেছিলো বিজয়ের মা-কে, সুজয়কে।

তাঁরা সে ঘটনাকে গুরুত্ব দেননি।

যদি দিতেন, যদি সে সময় যত্ন নিতেন!

তাহলে বিজয়ের ওপর তার ভাগ্য এমন নির্মম প্রতিশোধ নিতে কখনোই পারতো না।

আজ একলা একলা বসে বিজয়ের মনে পড়ে সব। মনে পড়ে মা, ভাই, সকলের থেকে সে অনেক দূরে সরে এসেছে। তাদের কাছে নিজের নিঃসঙ্গ হৃদয়ের বোঝা কোনদিনও সে নামাতে পারবে না। মনে পড়ে, দশ বছর আগে মা তাকে বিয়ে করতে বলেছিলেন শেষবারের মত। এখন আর কেউ তাকে কিছু বলে না। বিজয় দাশ-এর প্রয়োজন সকলের কাছেই ফুরিয়ে গিয়েছে।

নিজেকেই ভয় পায় বিজয়। ভয় করে তার নিজেকে নিয়ে থাকতে। সে শুধু মানুষের কাছে ঘুরতে শুরু করলো। এখানে যায়, ওখানে যায়—এর কাছে বসে, ওর কাছে বসে—সকলের সঙ্গে মিশতে চায়। স্কুল-জীবনের বন্ধু, কলেজ-জীবনের পরিচিত মানুষ—সকলকে খোঁজে বিজয়।

ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন চলে যায় সুচন্দ্রা সোমের বাড়ি। সুচন্দ্রা সোমের স্বামী মারা গিয়েছেন। তবু তিনি আজও সুচন্দ্রা সোম। সঞ্জয় সোম বর্তমানে তাঁর স্বামী।

পিকপিকদের কি ভাবে জব্দ করতে হয়, কেমন করে ঘরে মন বসাতে হয় তাদের—দেখা গেল সঞ্জয় সোম তা জানেন।

পিকপিক সোমকে যখন জানতো বিজয়, তখন তিনি নিঃসন্তান, অটুট যৌবনা। সঞ্জয় সোম পিকপিককে বিশ্বাস করেননি। গত পাঁচ বছরে চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছে পিকপিকের। বিজয়ের বুঝতে বাকি রইলো না পঞ্চম জনও আসছেন। পিকপিকের সে নিটোল সুন্দর দেহ মোটা হয়ে ঝুলে গিয়েছে। তিনি বিজয় দাশকে শুধু বেবির কথাই শোনান। সঞ্জয় সামনে বসে থাকেন! কার ক'টা দাঁত উঠলো, কে নার্সারী স্কুলে যাচ্ছে—এইসব কথা বলে গেলেন পিকপিক।

শুনতে শুনতে অসহ্য বোধ হলো বিজয়ের। বললো—সে চীনে ছবিগুলো গেল কোথায় ?

পিকপিক বলে—বিক্রী করে দিয়েছি।

উঠে পড়ে বিজয়। তাকে এগিয়ে দিতে এসে পিকপিক করুণ স্বরে বলে ওঠে—বিজয়, আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে। আমাকে শৃঙ্খলিত করে ফেলেছে সঞ্জয়।

কথা বলতে পারে না বিজয়। বেরিয়ে আসে। মনে হয় বুলা রায়ের মত পিকপিক সোম আজকাল করুণ হতে শিখেছে।

এখন তার জানতে ইচ্ছা করে বুলা রায় নতুন কি শিখলো ? তার মধ্যে কি পিকপিক সোমের দুর্বার জীবন-পিপাসা সঞ্চারিত হয়েছে ?

সবই বদলে গিয়েছে। একদিন বুলা রায় মনে করতো, সে বিয়ে করে অসুখী হয়েছে। যে বিজয়কে দেখে সে ডাক্তার অজয় রায়কে মনে করেছিলো অনেক ফ্যাকাশে—সে বিজয়কে আজ আর সে মধ্যবয়স্ক এই অসুখী মানুষটার মধ্যে খুঁজে পেল না।

বিজয়ের আধময়লা জামা-কাপড়, চোখের অস্থির দৃষ্টি, ধুলোভরা চটি আর উস্কোখুস্কো কাঁচাপাকা চুল দেখে বিরক্তিতে তার ভ্রূ উঠে গেল। তবে তার মনের বিরক্তি মুখে প্রকাশ পেল না।

মুখই মনের দর্পণ, এ কথা সত্যি সাধারণ মানুষের পক্ষে। হালকা বাদামী টেম্পেরা করা ঘরে যামিনী রায়ের ছবি, ক্যাকটাস আর নাগাদের বেতের টুপি সাজিয়ে যারা বাস করে—তাদের মনের ভাব কোনদিনও মুখে প্রকাশ পায় না। লতিকা রায় তাই হাসলো। বললো—চিনেছি এবার। আপনি তো সেই বিজয়বাবু! সিলেক্ট-এ দেখতাম না আপনাকে ? আপনার মুখে সেই আরাগঁর কবিতা কোনদিন কি ভুলবো ? ডো-ডো! লু-লু!

সি. এল. টি-র হাল্কা হলুদ আর সবুজ পোশাকে দুটি সুন্দর মেয়ে নাচতে নাচতে এলো স্কিপিং দড়ি হাতে। লতিকা রায় বললো—গাড়ি বের করেছে ? আমার ব্যাগটা নামিয়ে আনো ত'!

বিজয়ের দিকে ফিরে বললো—ভারি ইন্‌টারেস্টিং ছিলেন আপনি। কত কি যে করতেন, ভুলে গেছি অবশ্য! এখন কি করছেন?

বিজয়ের অসম্ভব হাসি পেল। সোডার মত দুর্দম হয়ে উঠে এলো হাসি। সে বললো—আমাকে চিরদিনই 'তুমি' বলেছো বুলা! 'ডার্লিং' ছাড়া কথা বলোনি। ঐ ডোডোকে আয়ার কাছে রেখে কি করেছো মনে নেই? তোমার সে কৌচটা কোথায় গেল? আমি-তুমি দু'জনের মাপে দেখে দেখে যেটা কিনেছিলে? নাকি সেটাতে আজকাল অজয় রায়ই শুচ্ছেন? তাঁর ভাগ্য তাহলে ফিরেছে বলো?

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো সে। তার কথা শুনে লতিকা রায়ের মুখ মেক্‌-আপের নীচে কতটা ফ্যাকাশে হলো, তা দেখতে বসে থাকলো না সে। হাসতে হাসতে, বিস্বাদ এ হাসি তার মুখটাকে তেতো করে দিলো। তবু যেন থামতে পারল না বিজয়।

বাড়ির কাছের পার্কটায় পোঁছে লোহার রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে বিজয় থামতে চেষ্টা করলো। কিন্তু হাসিটা থামাতে পারল না।

হাসতে হাসতে বুকে ব্যথা ধরলো। পার্কের ভেতরে এসে বসলো বিজয়। সেই বুড়ো ভিখিরীটা আজও বসে আছে। টিনের মগ থেকে ভাঁড়ে চা ঢালছে আর খাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে বিজয়ের মনে বিস্মৃতপ্রায় একটা কবিতার টুকরো খেলা করতে লাগল।

—'এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর অত্যন্ত প্রশান্ত হলো মন ;'

এমনও তার মনে হলো, উঠে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে,

—বাকি দুইজন কোথায়?

এ রকম যেই তার মনে হলো, তার যেন কেমন ধারণা হলো, এইসব কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ি ফিরে গিয়ে লিখে রাখা দরকার।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল সে। সামনে একটা বই পড়েছিলো। তারই ওপর লিখলো—আজও সেই একজন ভিখিরীকেই দেখলাম। আর দু'জন নেই। অথচ, জীবনানন্দ দাশের কথামতো তিনজনেরই থাকবার কথা ছিলো। শুধু তিনজন নয়, আধো আইবুড়ো তিনজন ভিখিরীর ওখানে থাকা দরকার। এবং সময়টা দিনের শেষ হওয়া দরকার। এখন বেলা বারোটা। তবে বারোটার সময়ই বা দিন শেষ হবে না কেন? সে জন্যে সূর্য ডোববার কি দরকার?

কিন্তু একটা ভিখিরীই বসেছিলো। আর দুজন গেল কোথায়? তারা কি মরে গিয়েছে? জীবনানন্দ দাশ মরে গিয়েছেন। ওরা দুজনও তবে মরে গিয়েছে। বাবা মরে গিয়েছেন। বুলাও মরে গিয়েছে। তবে মরে যাবার পরেও বুলা আমার সঙ্গে কথা বলছিলো। তাহলে তারা দুজনই বা, সেই দুজন ভিখিরীই বা, মরে গিয়েও পার্কে বসে ছিলোনা কেন?

পরে এই লেখাগুলি দেখে বিজয়ের মনের অবস্থা বোঝা গিয়েছে। আগেই বা কেউ দেখেনি কেন? কেন কেউ বোঝেনি, যে বিজয় একটু একটু ক'রে অবশ্যম্ভাবী একটা পরিণতির দিকে যাচ্ছে?

বিজয়ের কথাতেই কি তার জবাব আছে? তারপরে বিজয় লিখেছে,

> These 'why's have no answer,
> The answers have died,
> And when did they die?

· নিজের ভেতরে যে কোথাও একটা মস্ত গোলমাল হচ্ছে, আর সেই গোলমালটার হাত থেকে তাকে বাঁচতে হবে—এই ধারণা কিন্তু তখনই বিজয়ের মনে এসেছে। কেননা তখনই সে কাজ খুঁজতে শুরু করে। যে কোন রকম কাজ, যা নিয়ে সে বাঁচতে

পারে। নিজের হাত থেকে, নিজের সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তাধারা থেকে বাঁচবার জন্যে, কোন একটা কাজ খুঁজে না নিলে আর উপায় নেই। এ সময়ই, আর একটা বইয়ের পাতায় সে লিখেছে,

—আজও তিনখানা দরখাস্ত পাঠিয়েছি। আর এখন, যেমনই স্নান করে এসে বসেছি, অমনি আমার ভেতর থেকে মনটা বেরিয়ে গিয়ে ঐ খাটের নিচে বসেছে। কালকে আমার মনটা একটা বেগুনী রঙের পাখী হয়ে ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছিলো। তাকে ধরে এনে আমার মধ্যে পুরতে আমার কষ্ট হয়েছে। কেননা তারপরে আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল।

আজকে আমার মনটা একটা পাঁশুটে রঙের লম্বা বেড়াল হয়ে গিয়েছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে, আর নিজের থাবা চাটছে।

ওর মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। আমার দিকে তাকাচ্ছে আর নিজের থাবাটা গোলাপী জিভ দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার করছে। ও ভাবছে, এমনি করে ও সারারাত আমাকে কষ্ট দেবে। আমার ভেতরে আমার মনটা না থাকলে আমার কষ্ট হবে। ও ভাবছে আমি ওকে ছেড়ে রাখব।

কিন্তু ওকে আমি ছেড়ে রাখব না। তাহলে রাতে ঘুমোতে আমার কষ্ট হবে। খুব কষ্ট হবে। রাতে আমি শুয়ে থাকব, আর ও ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, হয়তো বা অন্ধকারটাকে লুফে নিয়ে খেলা করবে—আবার সেই মৃত ভদ্রলোকের কবিতার কথা ভাবছি?

না। আমার মনের কথা ভাবছি। এখন আমি দরজা, জানলা বন্ধ করব। নর্দমাটায় কাগজ ঠেসে দেব। কোথা দিয়ে কখন ও পালাতে চাইবে, ঠিক কি! তারপর ওকে আমি ধরব।

যতক্ষণ না ধরতে পারছি, ততক্ষণ ও বসে বসে আমাকে দেখুক, আর থাবা পরিষ্কার করুক।

এমনি করে রোজ আমার মনটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি

জানি, আমিই সেজন্য দায়ী। আমার মনটা যাতে ঐরকম হয়ে যায়, সে ইচ্ছে আমিই করেছিলাম।

কিন্তু ওর সঙ্গে ছুটোছুটি করতে আমার মাথার মধ্যে কষ্ট হয়। পরে আমি কিছু মনে করতে পারি না। যন্ত্রণায় আমার কপালটা ফেটে যায়।

এর থেকে, এই অবস্থার হাত থেকে আমি মুক্তি চাই। আমার মনটা এমন কিছু হোক, যাকে ধরতে আমার আর কষ্ট হবে না।

আজকে রাতে আমি ইচ্ছে জানিয়ে শোব, যে আমার মনটা যেন এবার একটা নির্জীব সাপ, অথবা একটা মরা মাছ হয়ে যায়। তাহলে তাদের ধরতে আমার বেশী কষ্ট হবে না।

কিন্তু ধরতে গেলে দেখব, যে মরা মাছ আঁশটে, পিছল, ঠাণ্ডা। তার চোখ দুটোকে আমি ভয় করি। ঐ চোখ আমি অনেক মানুষের মধ্যে দেখেছি।

না। মরা মাছ নয়। তাহলে আমার ঘেন্না করবে।'

পরে এইসব লেখা দেখে মনের রোগের ডাক্তার কত কথাই না বললেন, বোঝালেন। বোঝালেন যে ধাপে ধাপে বিজয়ের মনটা যে সবরকম সুস্থ ভাব হারিয়ে ফেলে একটা অন্ধকারে নেমে যাচ্ছিল, এ তারই পরিচয়। রোগ তখন এগিয়ে গিয়েছে।

তবে সে অনেক পরে। তখন আর বিজয় দাশকে কম মানুষই মনে রেখেছে।

বিজয় তখন কারো স্মৃতিতে নেই। বিজয় তখন সেই ঝর্ণাটার ধারে কোন পোড়া দাগ, বা ছাই হয়েও টিঁকে নেই। মানুষের মন তাকে ভুলেছে জীবনের নিত্যপ্রবহমান স্রোতে গা ভাসিয়ে, ভেসে গিয়ে। আর সেখানে, কয়েক বর্ষার জলেই সব ধুয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এখন আমি আর সে ঝর্ণাটার ধারে বেড়াতে যাই না। এখন, যখন বিজয়ের কথা বলছি, এখানেও বৃষ্টি নেমেছে। আমি বৃষ্টি দেখছি,

বর্ষা দেখছি, আর বিজয়ের কথা যত্ন করে মনে করে বলতে চেষ্টা করছি। ভালবেসে স্মরণ করতে চাইছি—

To remember with love

To remember with tears.

বিজয়ের সে সময়কার চিন্তার স্বাক্ষরগুলো আমি চেয়ে এনেছিলাম কুমুদের কাছ থেকে।

সে কথাগুলো এখন দেখি মাঝে মাঝে, আর দুঃখ হয়।

মনে হয়, যদি ক্ষুণ্ণ না হয়ে, রাগ না করে, অতীতে বিজয়কে বুঝতে চেষ্টা করতাম, তা হলে হয়তো সত্যিই বন্ধুর কাজ করতে পারতাম।

সে সময় সে সুযোগ মেলেনি। শুধু এই দুঃখ আমার মনে রয়ে গেল, যে বিজয়কে আমি ভুল বুঝে গেলাম চিরদিন।

সাধারণ একটা ছেলেকে—ব্যক্তিত্বপূজার ভেট দিয়ে দিয়ে আমরা দেবতা বানিয়েছিলাম। যখন বুঝলাম যে না, সে-ও ব্যর্থতায়, অক্ষমতায় ভরা একটা সাধারণ মানুষ—সেদিনই আমাদের মন ভেঙে গেল। আমরা নিরাশ হলাম।

বিজয়ের নিজের ভ্রান্তির কথা জানি। তার দাম ত' সে জীবন দিয়ে শোধ করে গিয়েছে।

আমাদেরও, আমারও যে একটা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল, তা আজ অস্বীকার করতে পারি না।

জীবিত বিজয়কে যে কথা বলতে পারি নি, মৃত বিজয়কে সে কথা বলতে ইচ্ছা করে। স্বীকার করতে ইচ্ছা করে।

দশ

হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে গেল বিজয়। মধ্যপ্রাচ্যের একটা তেলের খনির অফিসে কেরানীর কাজ। ভারতের বাইরে যেতে হবে। ইন্‌টারভিউ হবে এখানেই।

ইন্‌টারভিউ-এ যাবার আগে, চাকরিটা যে পেতেই হবে, সেই কথা মনে করে বিজয় পরিষ্কার জামাকাপড় পরলো। দাড়ি কামিয়ে স্নান করে ফিটফাট হলো। খেতে বসে, মাথা ঝুঁকিয়ে খেতে খেতে মাথাটা তুলে মাকে বললো—

—একটা কাজের জন্যে যাচ্ছি, জানলে মা ?

মা খুশী হলেন কি না বোঝা গেল না। বিজয় আবার বললো—

—চাকরির জন্যে।

ইন্‌টারভিউ-এ চাকরীটা হলো। অফিসারটি বাঙালী। বললেন—

—আমার বাড়িতে আসুন। সেখানে আপনার সঙ্গে ভাল করে কথা কওয়া যাবে। মাইনে আপনার সবশুদ্ধ তিনশো। তবে বাড়ি পাবেন। স্টাফ্ পাবেন। ফ্যাক্টরী ক্যান্টিনে খাবেন। ওসব জায়গায় আর খরচই বা কি! পয়সা আপনার জমবে। খেজুর আর আঙুর খেয়ে খেয়ে দেখবেন, শরীর আপনার ফিরে যাবে।

চাকরিটা হলো যখন জানলো বিজয়, তখন এই প্রথম, কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো তার মনে। তার মনে হলো, না ভাগ্য শুধু পরিহাসই করেনি তার সঙ্গে—তার অনেক ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করেও দিতে চাইছে।

মনে হলো, এবার, এই কাজটা নিয়ে সে সুস্থ একটা জীবন গড়ে তুলতে পারবে।

বিজয়ের মনটা তখন বাঁচবার জন্যে খড়কুটো খুঁজছে।

এই কাজটাকে তার একটা শক্ত ভেলা বলে মনে হলো।

মনে হলো এবার সে বাঁচবে। বিজয় দাশ যে কোথাও সার্থক হতে পারে, পরিপূর্ণতা পেতে পারে, সেই আশ্বাস এনেছে এই চাকরিটা।

খামখানা হাতে নিয়ে বিজয় বাড়ি ফিরলো একটা হাল্কা মন নিয়ে। অনেকদিন তার এমন ভালো লাগেনি। জীবনে বোধহয় এই প্রথম সে আনন্দ করে মা-কে ডেকে বাড়ি ঢুকলো—

—মা, আমার চাকরি হয়েছে মা, আমি কাজ পেয়েছি!

মা শুনে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। বিজয় মা-কে জড়িয়ে ধরলো, আর একসঙ্গে হেসে-কেঁদে মা আকুল হলেন।

সুজয় আর কুমুদ যে কি আনন্দিত হলো, বলা যায় না। দাদার জন্যে তাদেরই কি মনে দুঃখ ছিল না? তারাও কি সেই ছোটবেলা থেকে, প্রথম জ্ঞান হবার সময় থেকে ভাবতে শেখেনি, বিশ্বাস করতে শেখেনি, যে তাদের দাদা একজন অসাধারণ কেউ? তারপর বিজয় যখন বড় হয়েছে, তার ছাত্রজীবনে, দাদাকে জড়িয়ে তাদের মনেও একটা গৌরব ছিল বইকি। বাবা আর মা-র মনে যে আশাভঙ্গের দুঃখটা দিনে দিনে, একটু একটু করে বেড়ে উঠেছিল, তাদের মনে তার তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কেননা, তারা ধরে নিয়েছিলো তাদের দাদা একজন অসামান্য প্রতিভা, আর আমাদের মুখে শুনে শুনে তারাও বিশ্বাস করেছে, তাদের নিজেদের বিশ্বাসটা আরো জোর পেয়েছে, যে সমসাময়িক কালে প্রতিভা সবসময় সমাদৃত হয় না।

তারপর বিজয়ের অনূদিত গল্পের সেই বন্দীর মতো, বিজয়ের সামনে যখন একটা একটা করে জানালা বন্ধ হতে শুরু করলো, বিজয়ের পৃথিবীটা নির্মমভাবে সঙ্কুচিত হতে শুরু করলো, তখন সুজয় আর কুমুদ বিজয়কে দেখে ব্যথিত হয়েছে, দুঃখ পেয়েছে।

আজ বিজয় যখন কাজ পেল, আর ভাইদের ডেকে আনন্দ করে

চিঠিটা দেখাল, তারা যেন নতুন করে আশ্বস্ত হলো। আনন্দিত হলো। দাদাকে যে অনেক দূরে চলে যেতে হবে, সে-ও যেন ভাল। সে-ও যেন আনন্দের কথা, স্বস্তির কথা।

পুরনো দিনের চেনাপরিচিত যাদেরই পেল, তাদেরই সুজয় কুমুদ এই আনন্দের কথা গিয়ে জানিয়ে এল।

বাড়িতে এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেল তপন। বললো—যাবার আগে খাওয়াতে হবে বিজয়দা, ফাঁকি দিও না যেন।

মা কালীঘাটে গিয়ে একদিন পূজো দিয়ে এলেন। বিজয় কি কি খেতে ভালবাসে, যা তাঁর এতদিনে এত বছরে মনে পড়েনি—সেইসব জিনিস জোগাড় করে রান্না করতে ব্যস্ত হলেন। পোস্টঅফিসের এ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে সুজয় আর কুমুদ দাদার জন্যে স্যুটকেশ, হোল্ড-অল, জামা কাপড়, জুতো, এইসব কিনতে লাগলো।

তার সুখে সকলে সুখী হয়েছে দেখে, বিজয়ও আনন্দিত হয়। মা-র কাছে বসে গল্প করে। বাবার কথা জানতে চায়, ভাইদের সঙ্গে কথা কয়। কার মনে সে কবে ব্যথা দিয়েছে, কার সঙ্গে সে খারাপ ব্যবহার করেছে, সব মনে আনতে চেষ্টা করে।

এতবড় ছেলের এই শিশুর মতো মা-কে খুশি করবার সকরুণ প্রয়াস দেখে মা-র বুকটা কেন যেন ব্যথায় কেমন করে। তাঁর মনে হয়, অনেকগুলি বছর, অনেক ভালবাসার সময়, সব যেন হারিয়ে ফেলেছিল বিজয়। আজ তাই, জীবন থেকে ভাঙাছেঁড়া টুকরোগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে এমন করে বাঁচতে চাইছে সে।

বিজয়কে যিনি চাকরি দেন, সে ভদ্রলোক ভারী অমায়িক মিশুকে মানুষ। বলেন—আসুন আমার বাড়ি চা খেতে। আমি হেডঅফিসের লোক। আমার সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হবে আপনাকে।

ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনের সে বাড়িতে যায় বিজয়।

সুন্দর বাড়ি। কাঁচের বড় চৌবাচ্চায় হাঁস ছাড়া রয়েছে। বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা খরগোস। বাগানে ঘন সবুজ ঘাস। বারান্দা আর সিঁড়িও ঘন সবুজ কার্পেটে মোড়া। সহসা ভুল হয়ে যায়, একই ঘাসের কার্পেট যেন ঢেউ খেলিয়ে ঘরে উঠে এসেছে।

বারান্দায় বসে অফিসারটি খুলে ধরেন সিগারেটের টিন। চা-খাবারের প্রচুর আয়োজন আসে বিজয়ের সামনে। বলেন—এম. এ. পাশ মানুষ, পারবেন কি সেখানে থাকতে? তা ভালোই লাগবে, জানেন! তিনটে বছর কষ্ট করে থাকুন, তারপর ওরাই আপনাকে ঠিক ইণ্ডিয়াতে আনবে দেখবেন। আচ্ছা, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সে বেশ শিক্ষিত, বুঝলেন না? আমার মশায় মহা মুশকিল! নিজে তেলের ব্যাপারী, এদিকে ঘরে বিদুষী ভার্যা!

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসেন খুব। বিজয়কে আর হাসতে হয় না। ভদ্রলোক ডাকেন জোরে জোরে—ওগো, শুনছো! শুনে যেও। ওগো!

একটি সুশ্রী লক্ষ্মীর মত মহিলা দুটি ছেলের হাত ধরে আসেন। বলতে বলতে আসেন—ডাকছো? আমি যে ওদের ইস্কুলের প্রাইজে যাচ্ছি!

ভদ্রলোক বলেন—এঁর সঙ্গে আলাপ করে যাও। যাচ্ছেন সুদান।

হাত জোড় করে হাসিমুখে বিজয়ের দিকে ফেরেন মহিলা। বিজয়ও নমস্কার করে। তারপর দুইজনেরই হাত ঝুলে পড়ে বুকের ওপর। বিজয়ের চোখে অবিশ্বাস। এ হতে পারে না—এত বড় নিষ্ঠুরতা করতে পারে না তার ভাগ্য।

মাধবীর চোখে প্রথমে ফুটে ওঠে অবিশ্বাস। তারপর দেখা দেয় বিস্ময়। তারপর একটা করুণা। সে শুধু বলে—তুমি?

বিজয় উঠে দাঁড়ায় চোখে হাত চাপা দিয়ে। বলে—না!

—কি হয়ে গিয়েছো?

—না! না! না!…

প্রায় চিৎকার করে, কোন দুর্বার আঘাতকে ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে যায় বিজয়। লন পেরিয়ে অন্ধের মত ছুটে বেরোয় রাস্তায়। একটা ট্যাক্সি তাকে চাপা দেয় প্রায়। তীব্র হর্ন বাজিয়ে, পিচের উপর টায়ার ঘষ্‌টে ট্যাক্সিটা দাঁড়ায়। বিজয় যেন বেঁচে যায়। তখন সে এতটুকু দাঁড়াতে পারছে না। যে ট্যাক্সিটায় চাপা পড়ছিলো, সেটাতেই উঠে বসে সে।

পৃথিবীটা গোল, কিন্তু এত ছোট তার বৃত্ত? আজ যখন সে নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করছে, তখন তার ভাগ্য তাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো মাধবীর সামনে? মাধবীর স্বামী তাকে চাকরী দিলেন, আর গিয়ে দাঁড়াতে হলো মাধবীরই দরজায়?

যে মাধবী একদিন তাকে, শুধু তাকেই ভালবেসেছিল, আর যে মাধবী একদিন তার বুকভরা ভালবাসা নিবেদন করতে গিয়ে চরম অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিল, আজ বিজয় তারই দরজায় কৃপাপ্রার্থী? জীবনের এই চরমতম পরাজয়ের হাত থেকে তাকে মুক্তি দেবে কে? মৃত্যু? পৃথিবীটা ত' কবেই ছোট হয়ে এসেছে, বিজয় ত' কোন অভিযোগ করেনি। তাই বলে পৃথিবীটা এত ছোট হয়ে যাবে, যে সেখানে তাকে আর মাধবীকে দাঁড়াতে হবে মুখোমুখি, মাধবী ওপরে আর সে নিচে, বিজয় তা ভাবতে পারে না। তার চোখের সামনে দুনিয়াটা ঘুরতে থাকে। মনে হয় ট্রেনের তীব্র হুইশ্‌ল্‌-এর মতো তার চারিপাশে আকাশ বাতাস বধির করে একটা বিদ্রূপের হাসি ফেটে ফেটে পড়ছে। ঐ হাসি হাসছে তার ভাগ্য। একদিন বিজয় দাশ তার ভাগ্যকে স্বীকার করেনি। ভাগ্যের মুখে তুড়ি মেরে সে জয়ী হতে চেয়েছে। এই চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার ভাগ্য এতদিন অপেক্ষা করেছিলো।

দুই কানে হাত চাপা দেয় বিজয়। কিছুতেই সেই হাসির শব্দ চাপা দিতে পারে না। শব্দটা তার ভেতরে গিয়ে ফেটে ফেটে পড়ে।

বাড়িতে যে কেমন করে নামলো বিজয়, কেমন করে ঢুকলো আর সিঁড়ি দিয়ে উঠলো, তা সে-ই জানে। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয় বিজয়। তবু সেই শব্দটা তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

সে সিঁড়ি টপকে উঠতে থাকে। শব্দটা তার পেছনে পেছনে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। কানে হাত চাপা দেয় বিজয়। বারবার বলে—না! না!

শব্দটা তবু তার পেছন থেকে উঠে এসে সিঁড়ির মুখটা আটকে দাঁড়ায়।

তবে কি বিজয় নেমে যাবে? নেমে এসে পালিয়ে যাবে? মোড় ঘুরতে গিয়ে নিজেকে বিজয় আর সামলাতে পারে না। সিঁড়ির মাথা থেকে প্রথমে তিনটে সিঁড়ি টপকে আছড়ে এসে পড়ে চতুর্থ সিঁড়িতে, তারপর মাথাটা ঠুকতে ঠুকতে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে নিশ্চুপ হয়ে যায় বিজয়।

মা চীৎকার করে ছেলেদের ডাকেন। ধরাধরি করে তারা তোলে বিজয়কে। মাথাটা গড়িয়ে পড়ে বিজয়ের। মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে থাকে।

ডাক্তার আসেন। বরফ আসে ঝুড়ি বোঝাই করে। চেষ্টা চলে জ্ঞান ফেরাবার। শরীরটার ওপর যেন মাথার আর কোন শাসন নেই—তাই হাত-পা-গুলো কাঁপে, আছড়ায়—আঙুলগুলো পাকাতে থাকে বাতাস ধরবার ব্যর্থ চেষ্টায়।

জ্ঞান ফিরে আসে মাঝরাতে। তাকে যদি জ্ঞান বলা চলে। চোখ খোলে বিজয়।

সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ চাহনি। মাথাটা অস্বাভাবিকভাবে ঘুরিয়ে বিজয় এদিক থেকে ওদিকে চায়। কারুকে চিনতে পারে বলে মনে হয় না। চোখ দুটো অস্বাভাবিক লাল, মুখের ভাব দেখে ভয় পায় ভাইরা।

বিজয় হঠাৎ বলে—কুমুদ, দেওয়ালে ওটা কার ছায়া রে?

—কোনটা ?—কুমুদ দাদার চাহনি অনুসরণ করে তাকায় তারপর বলে—ও ত' তোমারই ছায়া, দাদা !

—আমার ছায়া ?

করুণ চোখে ছায়াটার দিকে তাকিয়ে থাকে বিজয়। তারপর উঠে বসে। ছায়াটাও উঠে বসে। বিজয় তখন বলে—আমার চেয়ে ছায়াটা অত লম্বা কেন রে ? ওকে একটু ছোট হতে বল না, শুনবে না ? ও এত বড় যে আমি ওকে ধরতে পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে।

মা চীৎকার করে কপাল চাপড়ে কেঁদে ওঠেন। আর সেই ছায়াটার দিকে তাকিয়ে, মাটিতে মুখ ঘষে, কুকুরের কান্নার মতো একটা দীর্ঘ তীব্র আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে বিজয়।

—আমি আমার ছায়াকে ধরতে পারলাম না, ধরতে পারলাম না !

বিজয় পাগল হয়ে গেল।

তারপর বিজয় চুপ করে। যে কয়দিন বাড়িতে ছিল, সে কারো সঙ্গে কথা কয়নি। একবারের জন্যও মুখ খোলেনি।

খোঁজ খবর নিয়ে, মধ্যপ্রদেশের এক এ্যাসাইলামের খবর সুজয়কে এনে দেয় তপন।

যে নতুন জিনিসপত্র নিয়ে বিজয়ের চাকরীতে যাবার কথা ছিল, সেইসব নিয়ে সে এ্যাসাইলামে রওনা হয়।

কোথাও যে তার যাবার কথা ছিল, আর সেজন্য যে সেজেগুজে নেবার প্রয়োজন আছে, তা বোধহয় বিজয়ের অবচেতনের কোথাও রয়ে গিয়েছিল। খুব বাধ্য ছেলের মতো, শান্ত হয়ে সে জামাজুতো পরে নিয়েছিল। মা তার মুখের দিকে চাইতে পারেননি। সে মাকে বলেছিল—মা, আমি যাচ্ছি। কুমুদ আমায় নিয়ে যাচ্ছে।

তারা রওনা হয়েছিল ফোরটিন আপ-এ। আসবার সময়ে ট্রেনে চুপ করে বসেছিল বিজয়। চুপ করে বসে ট্রেনের শব্দ শুনছিল।

রাত যখন বারোটা বাজল, কুমুদের হাত ধরে সে বললো—

—কুমুদ, আবার যদি ফিরে আসি, তবে আমার পা দুখানা কেটে ছোট করে দিস।

কুমুদ সভয়ে বললো—দাদা, অমন ক'রে বলো না।

বিজয় বললো—কেন রে! কেটে সমান করে দিস্। তাহলে হয়তো আমার ছায়াটা আমার সমান সমান হয়ে যাবে। এমনধারা আমার মাথার ওপর উঁচু হয়ে থাকবে না। তুই ত' জানিস না কুমুদ, আমি ওকে ধরতে পারি না—আমার কি কষ্ট হয়! ও শুধু আরো উঁচু হয়ে ওঠে, আর মজা দেখে। আমি কষ্টে মরে যাই কুমুদ!

কুমুদ মিনতি করে বলে—দাদা, একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর। একটু ঘুমোলেই রাত ভোর হয়ে যাবে। আমরা পৌঁছে যাব দাদা।

—ঘুমোলেই পৌঁছে যাব?

—হ্যাঁ দাদা, ঘুমোলেই তোমার ভাল লাগবে।

—ভাল লাগবে, তাই না কুমুদ?

—হ্যাঁ দাদা।

—আচ্ছা, তবে ঘুমোই।

ব'লে বিজয় বাধ্য ছেলের মতো শুয়ে পড়ে। শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ করে চোখ বোজে।

তখন ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি চলেছে। গুমগুম করে শব্দ উঠছে। রাতের আঁধারটা রক্তচোখে ভেদ করে চলেছে ফোরটিন-আপ। বিজয় গুণগুণ করে ছড়া বলবার সুরে জপ করে—

—ঘুমোলে আমি পৌঁছে যাব। ঘুমোলে আমার ভাল লাগবে। ঘুমোলে আমি পৌঁছে যাব। ঘুমোলে আমার ভাল লাগবে।

ঘুমের চেষ্টা করে বিজয়।

কিন্তু তখন অতিদূর থেকে যেন এই গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে আর একটা, আরো জোরালো শব্দ আসতে থাকে। কে আসছে? কি আসছে? উৎকর্ণ হয় বিজয়।

তখন রাত দুটো বাজতে পাঁচমিনিট বাকি। দুটো বাজতে তিন মিনিটে বম্বেমেল পাস করে যাবে, আর ফোরটিন-আপ স্লো করবে মোশান। দুটো গাড়ি যখন এক খণ্ডিত মুহূর্তের জন্যে মুখোমুখি হবে, তখন আশপাশের পাহাড়, বন ও প্রান্তরের নীরবতা একটা বিরাট শব্দের আঘাতে কেঁপে উঠবে। তারপর দুটো গাড়ি চলে যাবে দুই দিকে। আর তারপরেও মনে হবে, একটা স্থাবর ও জড় জগৎকে ক্ষণেকের জন্যে কাঁপিয়ে দিয়ে, তার সব স্থৈর্য ভেঙে দিয়ে চলে গেল ঐ গুম্ গুম্ শব্দটা। শুধু তার রেশটুকু কানে বাজছে।

বিজয় উঠে বসল। সেই শব্দটা ক্রমশঃ কাছে আসছে! বিজয়কে অন্যরকম দেখাচ্ছে। তার সমস্ত চেহারাটা উত্তেজনায় কাঁপছে। আরো কাছে এল শব্দটা। একটা অসীম ভয়ঙ্করতায় সব নীরবতাকে আচ্ছন্ন করে আরো কাছে এল। বিজয়ের চোখদুটো জ্বলছে। জ্বলছে ট্রেনের চোখ। লালচোখে বিজয়কে শাসাচ্ছে যেন। তাকে ডাকছে, হারা-জেতার খেলায় তাকে ডাকছে।

বিজয়ের সমস্ত শরীর শক্ত ও সোজা হয়ে উঠল। হাতদুটো ঘষতে থাকল বিছানায়। নাকটা অল্প অল্প করে ফুলছে। বড় বড় নিশ্বাস বেরিয়ে আসছে। ইঞ্জিনের মতো নিশ্বাস।

কিন্তু এ কি! তার গাড়িটা ঢিমিয়ে পড়ছে কেন? ঐ তো সেই দানবটা এসে পড়ল। আকাশ বাতাস বিপুল গর্জনে কাঁপাতে কাঁপাতে ঐ তো সে এসে পড়েছে। তাকে হারিয়ে দিতে এসেছে।

—কুমুদ এ কি হচ্ছে? আমি যে হেরে যাচ্ছি! কুমুদ— চীৎকার করে ওঠে বিজয়।

—দাদা। শান্ত হও দাদা।

—না-না। পিছিয়ে পড়লে চলবে না। আমাকে যে যেতেই হবে, এগিয়ে যেতেই হবে, কুমুদ—

কুমুদ প্রাণপণে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু বিজয়ের শরীরে তখন মত্ত হাতীর শক্তি। সে পারবে কেন? এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে বিজয় উঠে দাঁড়ায়। তার ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে উঠে দাঁড়ায়। ভাগ্য তাকে বারবার বঞ্চনা করেছে। বারবার হারিয়ে, মাড়িয়ে, ধুলোয় মিশিয়ে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেছে। আজ?

—না-না-না। তা হতে পারে না। কুমুদ, তা কিছুতেই হতে পারে না। কুমুদ—

একটা কঠিন আর্তনাদ করে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো বিজয়। বম্বে মেলটা কঠিনতর আওয়াজ করে উর্ধ্বশ্বাসে তার ওপর দিয়ে ছুটে চলে গেল। তার জীবনের সব ব্যর্থতা, বেদনা, বঞ্চনাকে মৃত্যু দিয়ে নিঃসঙ্কোচে ঢেকে দিল। শুধু, একটা পরাজিত, বেদনাহত প্রাণের আর্তনাদ ওখানকার বাতাসে মিশে রইল।

এই স্টেশানটার আলো তখন ফোরটিনআপ-এর খুব কাছাকাছি এসেছে।

লেখিকা পরিচিতি

১৯২৭ সালে ঢাকায় জন্ম। পিতা ও মাতা দুইজনের পরিবারেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি পরিবেশ ছিল। পিতা মনীশ ঘটক 'যুবনাশ্ব' নামে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং কল্লোল যুগের অন্যতম লেখক।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই শান্তিনিকেতনে স্কুল-জীবন অতিবাহিত হয়। মাঝে কয়বছরের ব্যবধানে পুনর্বার শান্তিনিকেতন থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেন। ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়তে পড়তে, ১৯৪৭ সালে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ হয়।

১৯৪০ সালে খগেন সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' কিশোর পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইয়ের সম্পর্কে ছোট একটি রচনা প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত রচনা।

দীর্ঘদিন সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে লিখেছেন। ১৯৪৭-এ রবিবাসরীয় বসুমতীতে 'পালক' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। শিশুদের জন্য ইতিহাস ও ভ্রমণের বই 'আলো হাতে' মৌচাকে ধারাবাহিক প্রকাশ হয়।

১৯৫২-১৯৫৪ ঝাঁসীর রাণীর একখানি প্রমাণ্য জীবনী রচনার উপাদান সংগ্রহ ও গবেষণায় ব্যয়িত হয়। এই সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তর ও মধ্যভারত ভ্রমণ করতে হয়। 'নটী' উপন্যাসের উপাদান সেই সময়ই আহৃত। 'ঝাঁসীর রাণী' দেশ-এ এবং 'নটী' চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'ঝাঁসীর রাণী' খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে ক্রমে 'যমুনা-কি-তীর' 'মধুরে মধুর' 'প্রেমতারা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

প্রিয় নেশা সাহিত্য পাঠ। কাব্য ও কথাসাহিত্য, ইতিহাস, সঙ্গীত, জীবনী এবং বন্যপ্রাণী ও শিকার সম্বন্ধীয় লেখা বিশেষ প্রিয়।